তুমিই দিয়াছ তারে, তুমি হাতে ধরে
এ সংসারে লয়ে চল প্রভু দয়া করে।
তুমি হও পিতা, মাতা, শিক্ষক তাহার
সত্য পথে ডাক তারে সংসার মাঝার।
পবিত্র নির্ম্মল কর, ক্ষুদ্র হিয়া মাঝে
তোমার আসন যেন সতত বিরাজে।
তব আশীর্ব্বাদ তারে থাকুক ঘিরিয়া,
ধ্রুবতারা সম থাক উজলি ও হিয়া।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

DECLARATION OF TRUST

BETWEEN

NARA NATH MOOKERJEE and anr

and

SURENDRA NATH TAGORE and anr

Dated the 22nd of august 1909.

This Indenture made this 22nd day of august in the year of Christ one thousand nine hundred and nine, *Between Nara nath Mookerjee*, son of Nerode Nath Mookerjee, Brahmin, Land-holder of 29 Benia-pooker Road in the suburbs of the town of Calcutta, Executor to the will of Neel Comul Mookerjee deceased and *Umerto Lall Gangooly* the only surviving son of Ram Lall Gangooly deceased Brahmin Land-holder of the one part and *Surendra nath Tagore* son of Satyendra Nath Tagore of 19 Store Road, Ballygunge in the suburbs of Calcutta aforesaid, *Pronoy Lall Gangooly* son of Benode Lall Gangooly deceased of No 181/4 Upper Circular Road Calcutta, Brahmin Land-holders of the other part. *Whereas* the said Ram Lall Gangooly who was in his life time a Hindu Governed by the Bengal School of Hindu Law departed this life on the fourteenth December, one thousand eight hundred and sixty one, leaving before his death made and published his Last Will and Testament whereby and whereof he appointed the said Neel Comul Mookerjee (since deceased) his executor and whereby he desired that the dividend on the two Bonded Ware House shares (particulars whereof are given in the schedule here under written) should be regularly paid over to the Brahmo Somaj as realised *and whereas* on or about the fourteenth day of January one thousand eight hundred and sixty two, Probate of the said Will was duly obtained from the Supreme Court by the said executor *and whereas* the said Neel Comul Mookerjee did all along during his life time pay the dividend on the two Bonded Ware House shares to the Adi Brahmo Somaj, *and whereas* on the thirty first day of October one thousand nine hundred and seven the said Neel Comul Mookerjee died leaving before his death made and published his Last Will and Testament and whereby and whereof he appointed his grandson the said Nara Nath Mookerjee (party hereto) and another his executors *and whereas* of the said executors only the said Nara Nath Mookerjee has proved the said Will of the said Neel Comal Mookerjee deceased and has obtained Probate thereof from the High Court of Judicature at Fort William in Bengal in its Testamentary and Intestate Jurisdiction *and whereas* by a certain Indenture being a deed of Trust bearing date the eighth day of January one thousand eight hundred and thirty and made between Dwarka Nath Tagore, Kally Nath Roy, Prosunna Kumar Tagore, Ram Chunder Bidyabagish and Ram Mohun Roy, of the one part, Baikunta Nath Roy, Radha Prosad Roy and Rama Nath Tagore of the other part all that the messuage tenement land hereditaments and premises therein particularly described were conveyed to the said parties therein of the other part subject to the several trusts and to and for the ends intents and purposes in the said Indenture declared with liberty to the said parties of the one part or the survivor or survivors of them with the consent and concurrence of the said parties thereto of the other part to appoint by any deed or writing under their or his hands and seals or hand and seal to nominate substitute and appoint some other fit person or persons to supply the place of the trustees or trustee respectively dying desiring to be discharged or refusing or neglecting or becoming incapable by or in any means to act as such Trustee *and whereas* the said Neel Comul Mookerjee has all along up to the time of his death paid the dividend on the

said two Bonded Ware House shares to the Trustee for the time being of the said Indenture of Trust (Commonly Called Trustees of the Adi Brahmo Somaj) *and whereas* Dwijendra Nath Tagore, Janaki Nath Ghosal and Dwipendra Nath Tagore are the present Trustees of the said Indenture of Trust and of the said Adi Brahmo Somaj *and whereas* the said two Bonded Ware House shares were last in the possession of the said Nara nath Mookerjee as the Executor of the Will of the said Neel Comul Mookerjee but have since then been transferred and made over to the said Surrendra nath Tagore and Pronoy Lall Gangooly upon trusts as herein before mentioned. *Now this Indenture witnesseth* that it is hereby agreed and declared by and between the parties hereto that the said Surendra Nath Tagore and Pronoy Lall Gangooly shall henceforth hold the said two Bonded Ware House shares particulars whereof are given in the schedule hereunder written upon trust to draw the dividend or bonus in respect thereof as and when the same will be declared and become due and make over the same to the said Dwijendra Nath Tagore, Dwipendra Nath Tagore and Janaki Nath Ghosal as such Trustees of the said Indenture of Trust and of the said Adi Brahmo Samaj or to the person or persons to be appointed Trustees hereafter in the place and stead of the said Dwijendra Nath Tagore, Dwipendra Nath Tagore and Janaki Nath Ghosal as Trustees of the said Deed of Trust and of the said Adi Branmo Somaj and it is hereby further declared that the said Trustees of this Indenture or the Survivor or survivors of them or their respective heirs executors administrators representatives and assigns shall be at liberty by a Deed or Deeds under their or his hand and seal to appoint Trustees or Trustee of this Indenture as and when occasion will arise. *In witness where of* the said parties to these presents have hereunto set their respective hands and seals the day and year first above written.

Signed Sealed and Delivered.

Sd. Nara nath Mookerjee
Sd. Umerto Lall Gangooly
Sd. Surendra nath Tagore
Sd. Pronoy Lall Gangulie

WITNESSES

Sd. Rabindra nath Tagore
Sd. Satyapersad Ganguli

SCHEDULE

Two Bonded ware House Association shares No. 1162 and 1165 of the nominal Value of Rs 500/ each, market value where of Rs 930/ each, Rs 1860/—

Sd. Nara nath Mookerjee
Sd. Umerto Lall Ganguly
Sd. Surendra nath Tagore
Sd. Pronoy Lall Gangulie

WITNESSES

Sd, Rabindra nath Tagore
Sd. Satyapresad Ganguli

M. M. Chatterjee,
Attorney at law.

নানা কথা।

আর্য্য-পৌণ্ড্রক।—ভাদ্র সংখ্যায় "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র নাথ মণ্ডল আর্য্য-পৌণ্ড্রক জাতির আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মনুসংহিতায় ১০মঅধ্যয়ের ১৪শ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চান যে, পৌণ্ড্রক জাতি ও অন্যান্য কয়েকটি জাতি উপনয়নাদি সংস্কার-বিহীন হইয়া ব্রাহ্মণ দর্শনাভাবে শূদ্রভাবাপন্ন হইয়াছে। কুল্লুক ভট্ট বলেন যে পৌণ্ড্র দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা ক্রমশঃ ক্রিয়াকলাপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক হোয়েনসাং পৌণ্ড্রদেশের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া গিয়াছেন। মালদহের অন্তর্গত পাণ্ডুয়া প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। কুলতন্ত্র নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়, যে এই পৌণ্ড্রকগণ রাঢ় দেশ হইতে বঙ্গে, তথা হইতে দক্ষিণ রাঢ়ে ও তৎপর ওড্র (উড়িষ্যা) দেশে গমন করেন। ২৪ পরগণার পোদেরা আপনাদিগকে পদ্যরাজ বা পদ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের পোদেরা আপনাদিগকে পৌণ্ড্র বলিয়া অদ্যাপি বলিয়া থাকে। ভাষাতত্ত্বানুসারে পৌণ্ড্রক শব্দ অপভ্রংশ হইয়া পদ্যরাজ, পদ্দ, পদ্য ও পোদ আকারে পরিণত হওয়া সম্ভব। নানাকারণে পৌণ্ড্রক ও পোদ এক জাতীয় বলিয়া অনুমান করিবার বিশেষ কারণ আছে।

গুণত্রয়।—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ "ভারতীর" ভাদ্র সংখ্যায় আর্য্য-আদর্শ ও গুণত্রয় শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দিয়াছেন। তিনি বলেন আর্য্য শিক্ষার মূলমন্ত্র সাত্ত্বিক-ভাব। যাহা সাত্ত্বিক তাহা বিশুদ্ধ।

মনের মালিন্য দুই প্রকার। ১ম জড়তা—ইহা তমোগুণ-প্রসূত; ২য় উত্তেজনা বা কুপ্রবৃত্তি জনিত মালিন্য—ইহাও তমোগুণ প্রসূত। তমোমালিন্য দূর করিতে হইলে রজোগুণের উদ্রেক দ্বারা তাহা দূর করিতে হয়। রজোগুণই প্রবৃত্তির কারণ, প্রবৃত্তিই নিবৃত্তির প্রথম সোপান। জ্ঞানই নিবৃত্তির মার্গ। কামনা-শূন্য হইয়া যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে নিবৃত্ত। কর্ম্মত্যাগ নিবৃত্তি নহে। সেই জন্য বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "রজোগুণ চাই, দেশে কর্ম্মবীর চাই, প্রবৃত্তির প্রচণ্ড স্রোত বহুক; তাহাতে যদি পাপ আসিয়া পড়ে, তামসিক নিশ্চেষ্টতা অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল"। সত্যই আমরা ঘোর তমোমধ্যে নিমগ্ন, অথচ স্বত্ব-গুণের দোহাই দিয়া মহা-সাত্বিক সাজিয়া বড়াই করি। যদি সাত্বিক ভাব জাগ্রত হইয়া রজঃ-শক্তির চালক হয়, তাহা হইলে তমোগুণের পুনঃ প্রাদুর্ভাবের ভয় নাই। উদ্দামশক্তি শৃঙ্খলিত নিয়ন্ত্রিত হইয়া উচ্চ আদর্শের বশে দেশের ও জগতের হিতসাধন করে। সত্বোদ্রেকের উপরে ধর্ম্ম-ভাব। স্বার্থকে ডুবাইয়া পরার্থে সমস্ত শক্তি অর্পণ—ভগবানকে আত্মসমর্পণ করিয়া সমস্ত জীবনকে এই মহা ও পবিত্র যজ্ঞে পরিণত করা। গীতায় কথিত আছে সত্ব রজঃ উভয়ে মিলিয়া তমোনাশ করে, একা স্বত্ব কখন তমঃকে পরাজয় করিতে পারে না। রাজা রাম-মোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশক স্বত্বকে পুনরুদ্দীপিত করিয়া নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। রাজসিক ভাব প্রসূত জাগরণ কখনও স্থায়ী বা পূর্ণ কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। তৎপূর্ব্বে জাতির অন্তরে কতকাংশে ব্রহ্মতেজ উদ্দীপিত হওয়া আবশ্যক। ভগবৎসেবা স্বত্বোদ্রেকের অন্য উপায়। কিন্তু ভাগবৎ সান্নিধ্যরূপ আনন্দ পাইয়া আমাদের স্বাত্বিক নিশ্চেষ্টতা আসিতে পারে। সেই আনন্দের আস্বাদ ভোগ করিতে করিতে দুঃখকাতর দেশের প্রতি ও মানব জাতির সেবায় পশ্চাৎমুখ হইতে পারি। গীতোক্ত ধর্ম্ম রজোগুণকে ভয় করে না। তাহাতে রজঃশক্তিকে স্বত্বসেবায় নিযুক্ত করিবার পন্থা আছে। প্রবৃত্তিমার্গে মুক্তির উপায় প্রদর্শিত আছে। আমরাও বলি ধর্ম্ম-জীবনের সঙ্গে কর্ম্মযোগ না থাকিলে ধর্ম্ম সর্ব্বাবয়ব পূর্ণ হয় না। "তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" ইহাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রদর্শিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্র। আমরা স্বাত্বিক নিশ্চেষ্টতা চাই না, কর্ম্মঠ ধর্ম্মজীবন চাই।

হাস্য।—Frankfort ফ্রাঙ্ক-ফোর্টের জনৈক ডাক্তার স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য রোগে "হাস্য-পরিহাস" ঔষধ স্বরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি বলেন এরূপ রোগী প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অনেকক্ষণ ধরিয়া হাস্য করিলে এ রোগ প্রশমন হয়। হাসিতে আরম্ভ করিয়া যে পর্য্যন্ত না চক্ষু হইতে জল বাহির হয়, ততক্ষণ হাসিতে হইবে। কিন্তু কোথা হইতে এত হাস্যের কারণ উপস্থিত হইবে, তাহাই সমস্যার কথা। আমরা জানি অনেকে বিলক্ষণ হাসাইতে পারেন। তাঁহাদের সাহায্য লওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর কি? Christian Life 7th august.

বুদ্ধদেবের অস্থি।—আমরা গতভাদ্রের পত্রিকায় লিখিয়াছি যে পেশোবারের নিকট একটি ভগ্ন স্তুপের অভ্যন্তর হইতে বুদ্ধদেবের চিতাভস্ম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঐ ভস্মের পরিণাম কি হইবে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এখন তাহার কোন শেষ মীমাংসা করেন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে তাঁহার সহকারী-সম্পাদক ঐ ভস্ম যাহাতে ভারতেই থাকে, তাহার জন্য বৌদ্ধ পত্রিকা জগৎজ্যোতি-সম্পাদককেও আবেদন করিতে বলিতেছেন।

The Association for the advancement of Scientific and Industrial Education of India সভা হইতে বিদেশে জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য সে দিন এক-শত যুবা প্রেরিত হইয়াছে। তাহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য বিগত ১২ই এপ্রেল তারিখে কলিকাতা টাউনহলে এক সভার অধিবেশন হয়। রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। লর্ড বিশপ কপল-ষ্টন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিদেশযাত্রী যুবক-গণকে সম্বোধন করিয়া আপনার অন্তরের আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া বলেন "ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ ধর্ম্মের অভিমুখীন; তাহারা পার্থিব বিষয়ের উপরিতন স্তরে অবস্থিত। শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারে দেশ সমুন্নত হইবে এই লক্ষ্য ধরিয়া তোমরা বিদেশ যাইতেছ, নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে। আমি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্বরচিত হৃদয়গ্রাহী অতি সুন্দর জীবনী পড়িয়াছি। তিনি তাঁহার সময়ের অতীত পুরুষ ছিলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। মনুষ্য জীবনে যাহা কিছু মহান্, যাহা কিছু সুন্দর, তাহার প্রতি তিনি অনুরাগী ছিলেন। যদিও এই সভা শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষার উৎসাহ দিতেছেন, ঐ যে সাধু মহাপুরুষের মহান্ আদর্শ এদেশে রহিয়াছে, যাহাতে যুবকেরা কতক পরিমাণে সেই আদর্শ গ্রহণ করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে এই সভা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করিবেন।"

উৎকট-সাধন।—তিব্বতের গিয়াংসি হইতে কয়েকমাইল দূরে পর্ব্বত-গাত্রে কয়েকটি গুহা আছে। তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ঠিক শ্রেণীবদ্ধ নহে। ঐ গুলি প্রস্তর দ্বারা বিনির্ম্মিত। প্রবেশদ্বার বাহির হইতে অর্গলবদ্ধ। ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম গুহার গাত্রে দীর্ঘ ও প্রস্থে ৬ ইঞ্চ পরিমিত একটি মাত্র গবাক্ষ আছে। গুহার অভ্যন্তরে এক একটি যোগী স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বাস করেন। গবাক্ষ দিয়া তাঁহার ভক্ষ্য প্রেরিত হয়। যোগী হাত বাড়াইয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারেন এইমাত্র। ঐ গবাক্ষের এক পার্শ্ব ঢালু করিয়া তাহার মধ্য দিয়া জল দিবার ও রাখিবার ব্যবস্থা আছে। গহ্বরদ্বার বন্ধ হইলে সেই বিজন নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে যোগীকে থাকিতে হয়। দিবা রাত্রের বোধ থাকে না। বাহিরের সঙ্গে যোগ কেবল ঐ গবাক্ষের মধ্য দিয়া আহার পান গ্রহণের সময়। ঐ গবাক্ষের ভিতর দিয়া বাহিরের আলোক পর্য্যন্ত দেখিতেও যোগীর পক্ষে নিষেধ। প্রথম অবস্থায় যোগী ব্রত ধারণ করিয়া ঈপ্সিত কয়েক মাস ঐ গহ্বরের মধ্যে অবস্থান করিয়া পরে বাহিরে আসিতে পারেন। কিন্তু সাধনমার্গে অগ্রসর হইলে জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্তও সেই সমাধি-গহ্বরের মধ্যে অবস্থান

করিবার নিয়ম আছে। এইরূপ একটি গহ্বরের নিকট গিয়া শুনিলাম, যে একটি যোগী উহার ভিতরে বিগত ২১ বৎসর ধরিয়া রহিয়াছেন। এই ব্যাপক কালের মধ্যে তিনি কাহারও সহিত আলাপ করেন নাই, আলোক দেখেন নাই, বা একবারও বাহিরে আসেন নাই। বাহির হইতে ইঙ্গিত করিবার অব্যবহিত পরে একখানি শীর্ণ হস্ত গবাক্ষ বিবর দিয়া সামান্য বাহির হইল, পরক্ষণেই অন্তর্হিত হইল। দেখিলাম সেই শীর্ণ হস্ত খানি কাঁপিতেছে। একটি দীর্ঘ-নিশ্বাসের অস্ফুট শব্দ কর্ণে পৌঁছিল। বুঝিলাম না যে কিপ্রকারে মনুষ্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ দারুন কৃচ্ছ্র সহ্য করিতে পারে। আরও চারি পাঁচটি গুহা দেখিলাম। সেই একই হৃদয় বিদারক দৃশ্য। শেষের দিকের একটি গুহার নিকট গিয়া শুনিলাম যে ৬০ বৎসর বয়স্ক একটি বৃদ্ধ বিগত ২২ বৎসর ধরিয়া তাহার ভিতর অবস্থান করিতেছিল, পূর্ব্ব দিবস তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। বিগত কয়েক দিন ধরিয়া সে আহার পান গ্রহণ করে নাই। ইঙ্গিতের কোন প্রতিশব্দ প্রদান করে নাই। সেই দিন প্রভাতে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রহরী দেখিয়াছে যে যোগীর দেহে প্রাণ নাই। তাহার শব দেহ দেখিতে চাহিলাম, কিন্তু শুনিলাম অপরের তাহা দেখিবার অধিকার নাই। দ্বারদেশে দেহান্ত সূচক পতাকা উড়িতেছে, মৃতের আত্মার কল্যাণের জন্য দীপাবলী জ্বলিতেছে। দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ বৎসরের কয়েকটি যুবাকে দেখিলাম তাহারা গুহার ভিতরে শিক্ষা-নবিশের ন্যায় কয়েক দিন থাকিয়া বাহিরে আসিয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতে সমস্ত জীবন তাহার অভ্যন্তরে ক্ষেপণ করিবার আশা রাখে।

ঐ যোগীরা গহ্বরের ভিতরে প্রবেশ সময়ে মনুষ্যের অস্থি হইতে বিনির্ম্মিত জপমালা, মনুষ্যের উরুর অস্থি নির্ম্মিত ভেরী, ভোজ্য পেয় রাখিবার জন্য নর কপাল লইয়া যায়; ভিতরে বসিয়া অর্থহীন সংস্কৃত মন্ত্র জপ করিতে থাকে, এবং হস্ত পদ অঙ্গুল নানা ভাবে সংন্যস্ত করিতে অর্থাৎ বিবিধ আসন ও মুদ্রা করিতে শিক্ষা করে। ভূত পিশাচ সিদ্ধিও তাহাদের অন্যতম লক্ষ্য। হায় জ্ঞানের অভাব ও কুসংস্কারের প্রভাব মনুষ্যকে যে কতদূর বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে পারে, ইহাই তাহার জাজ্বল্যতর প্রমাণ।

Waddell's Lhassa.

অবশ্য মধ্যে মধ্যে নির্জ্জন সাধনার উপকারিতা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। বুদ্ধদেবও এই ভাবে আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া জ্ঞানের আলোচনা বিনা এইরূপ দেহসাধ্য কৃচ্ছ্র সাধনে কি হইবে।

মৃত্যু।— আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাক্তার যোগীন্দ্রনাথ মিত্র ইহ জগতে আর নাই। ইঁহার জীবন নিষ্কলঙ্ক ছিল। নিজের অধ্যবসায় বলে কর্ম্মক্ষেত্রে নাম যশ উপার্জ্জন করিয়া এবং আত্মনির্ভর ও বিনয় নম্রতার দ্বারা এই সুখদুঃখময় সংসারে তিনি শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মই তাঁহার জীবনের সকল সময়ের বন্ধু ছিল। সেই ধর্ম্মই তাঁহাকে এই সংসারের পরপারে অমৃতধামে লইয়া গিয়াছে। তাঁহার পুত্রকন্যাগণের মুখশ্রীতেও তাঁহারই জীবনের আদর্শ দেখিতে পাই। তাঁহার শোকাতুরা বৃদ্ধা জননীকে আমরা আর কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব। তিনি ধন্যা, যে এমন সুপুত্র তিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ অধ্যয়নশীল, গ্রন্থকর্ত্তা এবং ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও প্রচারক ছিলেন। তাহার শ্রাদ্ধদিনের দান ২০, মুদ্রা আমরা প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

দান।—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী মহাশয় সমাজের উন্নতি কল্পে ৮ টাকা এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত মহাশয় নববর্ষ উপলক্ষে ৩৲ টাকা দান করিয়াছেন।

১৮৩১ শকের বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্যপ্রাপ্ত স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন রায়	কলিকাতা	২৲
" " গৌরীশঙ্কর রায়	কটক	৩৶৹
" ডি, এন্, চাটার্জ্জি	কলিকাতা	৩৲
" বাবু সুশীলকুমার ঘোষ	বর্ম্মা	৫৲
" " ললিতমোহন সিংহ	চুঁচুড়া	২৩৶৹
" মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	কাশিমবাজার	১২৷৶৹
" বাবু মদনমোহন ব্রহ্মচারী	উত্তরকাশী	৫৷৷৶৹
" " যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৷৷৹
" " অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	১৸৶৹
" " গোকুলচন্দ্র ধর	বাঁশবেড়ে	৷৹
" " সীতানাথ বকসী	আরানিনী	৩৷/৹
" " অবিনাশচন্দ্র পাল	আলিপুর	১৷৷৹
" আর, টি, ভট্টাচার্য্য	কলিকাতা	১৷৷৹
" বাবু নিরঞ্জন রায় চৌধুরী	বড়িশা	১৲
" " সুরেন্দ্রনাথ বসাক	কলিকাতা	১৷৷৹
" " হরিমোহন রায়	নিগবাজার	৬৷৶৹
" " বিপিনবিহারী দে	কলিকাতা	১৲
" " আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	ঐ	২৲
" " পূর্ণচন্দ্র দত্ত	ঐ	১৷৷৶৹
" কুমার ঋষিকেশ লাহা বাহাদুর	ঐ	৩৲
" বাবু বিহারিলাল মল্লিক	ঐ	৩৲
" " কানাইলাল শেঠ	ঐ	৪৷৹
" " সতীশচন্দ্র সিংহ	ঐ	২৲
" এস, কে, লাহিড়ী	ঐ	৩৲
" বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	৬৲
" " প্রসাদদাস বড়াল	ঐ	৩৲
" " দেবেন্দ্রনাথ রায়	ঐ	১৷৷৹
" " বিহারিলাল রায়	বরিশাল	২৷৷৹

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, বৈশাখ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৯০৸ ৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩৫৬৯ ৵৯
সমষ্টি	...	৩৯৫৯৸৶৩
ব্যয়	...	৪১৫ ৶৩
স্থিত	...	৩৫৪৪৸০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৯৪৪৸০

৩৫৪৪৸০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ২২৯৲

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসিক দান
২০০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী হইতে প্রাপ্ত
৮৲

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী
১০৲

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী
২৲

শ্রীমতী সুকেশী দেবী
১৲

শ্রীমতী চারুবালা দেবী
১৲

শ্রীমতী ইরাবতী দেবী
১৲

২৩৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫৲

শ্রীমতী সুকেশী দেবী
১৲

৬৲

২২৯৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫২।০
পুস্তকালয়	...	৭॥৶০
যন্ত্রালয়	...	৬৯৶৬
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৩২৸০
সমষ্টি	...	৩৯০৸৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২১৮॥ ৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৯৸৶৬
পুস্তকালয়	...	১৩৵৯
যন্ত্রালয়	...	১৩৪। ৬
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		১০॥ ৯
সমষ্টি	...	৪১৫ ৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, জ্যৈষ্ঠ মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪৬৫৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩৫৪৪৸০
সমষ্টি	...	৪০০৯৸৶০
ব্যয়	...	৩২১।৶৩
স্থিত	...	৩৬৮৮।৶৯

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
১০৮৮।৶৯

৩৬৮৮।৶৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ২১৩৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া যায়
২০০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী	২৲
শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী	১৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস	১০৲
	২১৩৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১২৸০
পুস্তকালয় ...	৫৶০
যন্ত্রালয় ...	২৩৩/০
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন	১।০
সমষ্টি ...	৪৬৫৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ...	১৬৬৸৶৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৮৻৬
পুস্তকালয় ...	১২৶৬
যন্ত্রালয় ...	১১০/৬
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন	৪৶৩
সমষ্টি	৩২১।৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, আষাঢ় মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় ...	৩৬৫/০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৩৬৮৮।৶৯
সমষ্টি ...	৪০৫৩॥ ৯
ব্যয় ...	৩৮৬৸৶০
স্থিত	৩৬৬৬॥/৯

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত সাতকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
১০৬৬॥/৯

৩৬৬৬॥/৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২১০৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত
২০০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
১০৲

২১০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৮৸৶০
পুস্তকালয় ...	১১/০
যন্ত্রালয় ...	৬৯৶০
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন	৪১৲
ইলেক্‌ট্রিক্‌ লাইট ...	২৫৲
সমষ্টি ...	৩৬৫/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ...	২২৩৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৮।/৯
পুস্তকালয় ...	৬৶৬
যন্ত্রালয় ...	১২২।০
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন	৫॥ ৯
ইলেক্‌ট্রিক্‌ লাইট ...	১॥০
সমষ্টি ...	৩৮৬৸৶০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

সপ্তদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০।
৭৯৬ সংখ্যা ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব।

এই ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনতম যুগ হইতে ধর্ম্মের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। সমুদ্র যেমন নিস্তরঙ্গ নহে, তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত অবিরাম চলিতেছে, এদেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ। বেদের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিলে আমরা কি দেখিতে পাই; আর্য্য-ঋষিগণ অনন্তদেবের সন্ধানে ঘুরিতেছেন; তাঁহারা বায়ুবরুণ বজ্রবিদ্যুতের স্তব করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি কেবল মাত্র প্রকৃতির বৈচিত্রের মধ্যে প্রভূত শক্তিমান পদার্থ-নিচয়ের মধ্যে আবদ্ধ নহে, কিন্তু সকল শক্তির মূল কারণের দিকে তাঁহারা তাকাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহাদের এই কালব্যাপী সফল চেষ্টায় পরে এদেশে উপনিষদের উন্মেষ হইল। উপনিষদ্কার ঋষিগণ সেই এক ঈশ্বরের সন্ধান পাইয়া, তাঁহাকে আপনাদের সাধনা প্রভাবে লাভ করিয়া, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অবধারণে পারদর্শী হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ" সূর্য্য আমাদের দেবতা নহেন, চন্দ্র তারা আমাদের উপাস্য নহেন, অগ্নি-বিদ্যুৎ আমাদের আরাধ্য নহেন; কিন্তু যে মহাশক্তি সূর্য্য-চন্দ্র-তারার পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদিগকে কক্ষপথে নিয়োজিত করিতেছে, বিদ্যুতে অগ্নিতে তেজ বিবরণ করিতেছে, তিনিই আমাদের পরমারাধ্য পরম দেবতা। প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার এই যে সন্ধানলাভ, তাহা স্মরণে চিরজাগ্রত রাখিবার জন্য আমরা প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনার প্রথম মন্ত্রে উচ্চারণ করি, "যো দেবোঽগ্নৌ, যোঽপ্সু যো বিশ্বংভুবনমাবিবেশ যওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ" যিনি অগ্নিতে রহিয়াছেন অথচ যিনি অগ্নি নন, যিনি জলে রহিয়াছেন অথচ জল নন, যিনি ওষধি বনস্পতিতে বিশ্বভুবনে রহিয়াছেন অথচ ইহাদের কিছুই নন, তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা। আমরা আপাতদৃষ্টিতে এই মন্ত্রের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু এই মহাসত্যে পৌঁছিতে ঋষিদিগের যে কত যুগব্যাপী সাধনা ও তপস্যা লাগিয়াছিল তাহা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। বাস্তবিকপক্ষে

শক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া শক্তিমানের উপাসনা —এই যে সোপান হইতে সোপানান্তরে গমন, এতই কঠিন ও অভিনিবেশ-সাপেক্ষ, যে এই জ্ঞানোজ্জ্বল বর্ত্তমান শতাব্দিতে আমাদের দেশে অনেকেই ঠিকভাবে তাহা ধরিয়া উঠিতে পারেন না। কেহ বা গঙ্গাকে দেখিয়া প্রণিপাত করেন, কেহ ওষধি বা বৃক্ষবিশেষকে নমস্কার করেন, কেহ বা সূর্য্য কেহ বা অগ্নির পূজা করেন, এই রূপ বিবিধ শক্তির আরাধনা করেন। কিন্তু এ সকলই যে তাঁহারই শক্তির বিকাশ, তাঁহার অভাবে যে ইহার কিছুই থাকিতে পারে না, এ সকলের পশ্চাতে যে তাঁহারই হস্ত তাঁহারই শক্তি কার্য্য করিতেছে, কয়জন তাহা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তিমানকে স্মরণ করেন। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" এ সকলেরই আবির্ভাব ও দীপ্তি যে তাঁহা হইতে, কয়জনের দৃষ্টি ও চিন্তা সে দিকে ধাবিত হয় এবং কয়জনের মস্তক সেই শক্তিমানের উদ্দেশে অবনত হয়। এক ভাবে বলিতে গেলে বেদের ভাব 'প্রকৃতির ভিতরে ঈশ্বর সন্দর্শন'; কিন্তু উপনিষদের ভাব আরও গভীর ও সমুন্নত, সে কি না 'আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে সন্দর্শন'। প্রকৃতি তাঁহাকে দেখিবার দর্পণ বটে, কিন্তু আমাদের আত্মাই তাঁহাকে দেখিবার সুবিমল দর্পণ। আত্মার ভিতরে যদি পরমাত্মার নিষ্কলঙ্ক ছবি সন্দর্শন করিতে পারিলে, তবে ত তোমার সাধনার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইল।

মানবাত্মা তাঁহারই আদর্শে গঠিত। কিন্তু এই আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে সন্দর্শন, তাঁহার সত্ত্বাতে তাঁহার ভাবে অবগাহন, ইহা হইতে বেদান্ত উত্তরকালে আমাদিগকে অন্য পথে লইয়া চলিল। বেদান্ত বলিলেন 'তাঁহার সঙ্গে আপনার অভেদ' চিন্তা কর। যদি এই সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পার তাহা হইলে মুক্তি ত তোমার করতলন্যস্ত। আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে সন্দর্শন—উপনিষদের এই সরস ভাব হইতে লোকে যতই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ চিন্তার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সাধন নীরস হইতে আরম্ভ করিল, উপাস্য উপাসক ভাব তিরোহিত হইবার উপক্রম হইল, সংসার-বৈরাগ্য ও সর্ব্ববিধ কঠোরতা আসিয়া ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। সর্পে যেমন রজ্জুভ্রম হয়, সেইরূপ মরীচিকা ও ভ্রান্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, বেদান্তের এই শিক্ষা লোক সমাজে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যে শিক্ষা আত্মার প্রকৃতির বিরোধী, তাহা ব্যাপক কাল ধরিয়া মনুষ্যকে ধরিয়া রাখিতে পারে না।

এ দিকে বেদের ক্রিয়াকাণ্ড জীবহিংসা অনুন্নত মানবগণকে পূর্ব্ব হইতেই ঘেরিয়া লইয়াছিল। উপনিষদের ভাব বেদান্তের ভাব একমাত্র জ্ঞানোন্নত লোকের ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু লোকে যতই কেন বিপথগামী হউক না, জনসমাজ যতই কেন প্রকৃত ধর্ম্মপথ কল্যাণমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হউক না, যখনই তাহা সত্য সত্যই উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা স্পর্শ করে, তখনই প্রতিঘাতের সময় উপস্থিত হয়। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে বুদ্ধদেবের জন্ম। তিনি "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" বলিয়া ঘোষণা করিলেন, ধর্ম্মের নামে অকারণ জীবহত্যার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি আরও বলিলেন কর্ম্ম মাত্রেই পুনর্জ্জন্ম লাভের হেতু। এই বিবিধকষ্টক্লেশসঙ্কুল পুনর্জ্জন্ম যাহাতে না হয়, তাহার জন্য বাসনা-ত্যাগের উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন যদি বাসনা উন্মূলন করিতে পার, তাহা হইলে নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হইবে।

এই ভাবে দিন কাটিয়া যায় গীতার শিক্ষা লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইল। গীতা সমন্বয় গ্রন্থ, গীতাকার কাহাকেও উপেক্ষা না করিয়া বলিলেন আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে ত দেখিতেই হইবে, তাহার সঙ্গে সর্ব্বভূতে তাঁহার অধিষ্ঠান হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, সমদর্শী হইতে হইবে, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, সংসার অচল হইয়া উঠিবে, ঈশ্বরের লক্ষ্য ব্যর্থ হইবে। ফলকামনা শূন্য হইয়া কর্ত্তব্য সাধন কর, কর্ত্তব্যের অনুরোধে কর্ত্তব্য পালন কর, ফলের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। এই ভাবে যদি জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পার মুক্তিলাভে নিশ্চয়ই সক্ষম হইবে।

এইভাবে যুগযুগান্তর চলিতে চলিতে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের সূচনা। বিবিধ কাহিনীর ভিতর দিয়া ধর্ম্মের ভাবকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য পুরাণের বিপুল চেষ্টা, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ঘাতপ্রতিঘাত তান্ত্রিক-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তান্ত্রিক ধর্ম্ম অন্যান্য বিষয়ে মানবাত্মার উপযোগী না হইলেও তাহার অনন্য সাধারণ বিশেষ শিক্ষা এই ঈশ্বরকে মাতৃভাবে সন্দর্শন করা। মাতৃভাবে ঈশ্বরের সাধনা এই যে সমুন্নত শিক্ষা ইহা অন্য দেশের ধর্ম্মের ভিতরে নিতান্তই বিরল। বেদ তাঁহাকে পিতৃভাবে সেবা করিবারি শিক্ষা প্রদান করিয়াছে। পিতা নোঽসি" তুমি আমাদের পিতা, আর মনুষ্য মাত্রেই ভ্রাতা, এ শিক্ষা বেদ আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল। ঈশ্বর যে আমাদের বন্ধু, তিনি যে আমাদের সুখ দুঃখে উদাসীন নন, এ শিক্ষাও বেদ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিল। কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্তে মৈত্রী-ভাব, বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদিগকে এ সত্য শিক্ষা দিয়াছিল, কিন্তু তান্ত্রিক ধর্ম্ম করুণাময়ী মাতা বলিয়া তাঁহাকে সাধন করিতে আমাদিগকে বলিয়াছেন। পিতার স্নেহের ভিতরে যেন একটু কঠোরতা আছে, কিন্তু মাতার করুণার ভিতরে কেবলই ক্ষমা—কেবলই দয়া। আমরা যতই কেন মহাপাপে পাপী হই না, তাঁহার নিকট হইতে পরিচ্যুতির কোন আশঙ্কা নাই। তিনি তাঁহার উদার ক্রোড় প্রসারিত করিয়া আমাদের মত দুর্ব্বল সন্তানকে কেবলই আহ্বান করিতেছেন।

কিন্তু তান্ত্রিক ধর্ম্মের অন্য দিকে যে জীব-হিংসা রহিয়াছে, মূর্ত্তিপূজার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা আর স্থায়ী হইল না। গৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইয়া ঘোষণা করিলেন "নামে রুচি ও জীবে দয়া" ইহাই ধর্ম্ম। যাহা উহার প্রতিকূল তাহা ধর্ম্ম নহে। বেদ উপনিষদ ঈশ্বরকে রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু বলিয়াছেন, কিন্তু গৌরাঙ্গদেব যে ভক্তির বন্যা বঙ্গদেশে প্রবাহিত করিলেন, নামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য যাহা ঘোষণা করিলেন, তাহা বাস্তবিকই অশ্রুতপূর্ব্ব ও নিতান্তই মর্ম্মস্পর্শী।

বেদের শিক্ষায় উপনিষদের শিক্ষায় অবতারবাদের মূর্ত্তিপূজার নাম গন্ধ না থাকিলেও পরবর্ত্তী সময়ে অবতারবাদ ও মূর্ত্তিপূজা এদেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ভিতরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং এই সকল অবতার অল্পে অল্পে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষা এ দেশে বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইল এবং আমাদের বদ্ধ-দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইতে আরম্ভ করিল। তাহারই ফলে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কি শিক্ষা প্রদান করিতেছেন

আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইবে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন প্রকৃতির ভিতরে ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিতে অভ্যাস কর, আত্মার ভিতরে তাঁহাকে নিরীক্ষণ কর, অন্য সকল প্রকার বাসনা পরিহার করিতে পার, কিন্তু তাঁহাকে পাইবার কামনা ও উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইও না, জীব হত্যা করিও না, ধর্ম্মের নামে রক্তপাত করিও না, উপাস্য উপাসকের নিত্য সম্বন্ধ রক্ষা কর, ভয়ে বিপদে সম্পদে দারিদ্রে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কর, তাঁহার অমোঘ আশ্রয় গ্রহণ কর, ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান কর, সমদর্শী হও, সকলস্থানে তাঁহার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ কর, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত তাবৎ জীবে দয়া প্রদর্শন কর, তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন কর, ঈশ্বরকে পিতৃ ভাবে—বন্ধুভাবে—মাতৃভাবে পূজা কর, সকল মনুষ্যের সহিত ভ্রাতৃ—সৌহার্দ্দ্য স্থাপন কর, অবতারবাদ মূর্ত্তিপূজা ও মধ্যবর্ত্তীতাবাদ একেবারে পরিত্যাগ কর, তাঁহার আমার মধ্যে অন্য কোন ব্যবধান নাই আমরা তাঁহাকে প্রাণভরে ডাকিলে তিনি আমাদের প্রার্থনা বাক্য গ্রহণ করিবেনই এই জলন্ত বিশ্বাসে তাঁহার কৃপা ভিক্ষা কর; চারত্রকে নির্ম্মল কর, অন্তরের ভিতরে যে সকল সাধুভাব আছে তাহা বিকশিত কর, ব্রহ্মোপাসক গৃহস্থ হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, গৃহীর কার্য্য সাধন কর, হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার আরাধনা কর, তাঁহার স্বরূপকে খর্ব্ব করিও না, তিনি অপ্রতিম—তিনি নির্ব্বিকার—নিরাকার তিনি পরম গুরু এই ভাবে সাধনা কর, সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। সংক্ষেপতঃ ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

শ্বাসযন্ত্রের বৈচিত্র্য।

মানুষ এবং উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদিগের শ্বাসযন্ত্রের বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ইহারা সকলেই ফুস্‌ফুস্ দ্বারা বায়ু হইতে অক্সিজেন-বাষ্প গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে। স্পঞ্জের ন্যায় ছিদ্রবহুল এবং স্থিতিস্থাপক পদার্থ দ্বারা এই সকল ফুসফুস্ (Lungs) গঠিত। ছিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক থাকায়, উহার অনেক অংশই বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া প্রচুর অক্সিজেন্-বাষ্প শোষণ করিতে পারে।

মেরুদণ্ডবিশিষ্ট নিম্ন-শ্রেণীর প্রাণীদিগের শ্বাসযন্ত্রের ব্যবস্থাও পূর্ব্বের অনুরূপ। তবে উচ্চ-শ্রেণীর প্রাণীদিগের ফুস্‌ফুসের ন্যায় ইহাদের ফুস্‌ফুসে অধিক ছিদ্র দেখা যায় না। এগুলি যেন কতকটা নিরেট ধরণের। ক্ষুদ্র দেহের পোষণের জন্য যে টুকু অক্সিজেনের আবশ্যক, ঐ সকল নিরেট ফুস্‌ফুস্ তাহা বায়ু হইতে অনায়াসেই সংগ্রহ করিতে পারে।

মেরুদণ্ডযুক্ত প্রাণীদিগের শ্বাসযন্ত্রে যে একটা ঐক্য দেখা গেল, অপর প্রাণীদিগের যন্ত্রে সেপ্রকার একতা মোটেই দৃষ্ট হয় না। বহু বিচিত্র এবং অদ্ভুত উপায়ে ইহারা শ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে। মাকড়সার ফুস্‌ফুস্ আছে বটে, কিন্তু সেই যন্ত্রটি উহাদের শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এতই বিচিত্র হইয়া পড়িয়াছে যে, হটাৎ দেখিলে তাহাকে ফুস্‌ফুস্ বলিয়া চিনিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদিগের ন্যায় ইহাদের দুইটি ফুস্‌ফুসের আবশ্যক হয় না। একটির দ্বারাই উহারা বেশ শ্বাসকার্য্য চালাইয়া লয়। তা ছাড়া সাধারণ ফুস্‌ফুসে যেমন অসংখ্য ছিদ্র দেখা যায়, ইহাদের ফুস্‌ফুসে সেগুলি পর্য্যন্তও

থাকে না। আঁশের ন্যায় কতকগুলি পাতলা অস্থিময় ফলক উপর্য্যুপরি সজ্জিত থাকিয়া ইহার রচনা করে। শ্বাসগ্রহণ করিলে ঐগুলিই বায়ুতে পূর্ণ হয়, এবং যন্ত্রের উপরে যে রক্তস্রোত সর্ব্বদা প্রবাহিত থাকে, তাহা ঐ বায়ু হইতেই অক্সিজেন শোষণ করে।

ভেক প্রভৃতি উভচর প্রাণিগণের শ্বাসযন্ত্র আরো অদ্ভুত। যখন সলাঙ্গুল ব্যাঙাচির আকারে ইহারা জলচরের ন্যায় জলে বাস আরম্ভ করে, তখন শ্বাসগ্রহণের জন্য মৎস্যের কান্‌কার (Gill) ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র উহাদের দেহে সংলগ্ন থাকে। জলে মিশ্রিত অক্সিজেন-বাষ্প সেই কান্‌কার সংস্পর্শে আসিলেই শরীরের রক্ত সেই বাষ্পকে শোষণ করিয়া লইতে আরম্ভ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উভচর প্রাণীগুলি একটু বড় হইলে, তাহারা আর কান্‌কার দ্বারা শ্বাসগ্রহণ করে না। বয়োবৃদ্ধির সহিত ঐ শ্বাসযন্ত্র ক্রমে লোপ পাইয়া ফুস্‌ফুসের উৎপত্তি করিতে থাকে। পূর্ণবয়স্ক উভচরগণ সেই ফুস্‌ফুসের দ্বারা আমাদেরই মত বায়ু হইতে অক্সিজেন্ গ্রহণ করিয়া শ্বাসকার্য্য চালাইতে শিক্ষা করে।

কান্‌কা ও ফুস্‌ফুসের মধ্যে আকারগত অনেক পার্থক্য থাকিলেও, উহাদের কার্য্যে সম্পূর্ণ একতা দেখা যায়। প্রাণীগণ যখন বায়ু দ্বারা ফুস্‌ফুস্ পূর্ণ করিতে থাকে, সেই বায়ুর অক্সিজেন্ রক্তে মিশিয়া যায়। জলে অধিক বায়ু মিশ্রিত থাকে না, যাহা একটু থাকে তাহাই দেহস্থ করিয়া জলচর প্রাণিগণকে জীবন রক্ষা করিতে হয়। স্থলচর প্রাণী সকল যেমন আকাশের বায়ু টানিয়া ফুস্‌ফুস্ পূর্ণ করিতে থাকে, উহারাও সেই প্রকার পুনঃ পুনঃ জল টানিয়া লইয়া কান্‌কার উপর দিয়া অবিরাম চালাইতে আরম্ভ করে। জলে যা' একটু আধটু অক্সিজেন মিশ্রিত থাকে, কান্‌কার রক্ত তাহা এই সুযোগে প্রায় নিঃশেষে শোষণ করিয়া দেহস্থ করিয়া ফেলে।

পতঙ্গজাতীয় প্রাণীগুলির জীবনের ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তাহাদের শ্বাসযন্ত্রও তেমনি অদ্ভুত। পতঙ্গের শ্বাসযন্ত্রের সহিত ফুস্‌ফুস্ বা কান্‌কার একটুও সাদৃশ্য দেখা যায় না। একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম নল পতঙ্গ মাত্রেরই দেহের সর্ব্বাংশে জটিলভাবে পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। এই নলিকাগুলিই উহাদের শ্বাসযন্ত্র। এগুলি যখন বায়ুপূর্ণ হইয়া পড়ে, তখন দেহের প্রায় সর্ব্বাংশ বায়ুস্থ অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে।

ফাঁপা হইলে জিনিস প্রায়ই ভঙ্গপ্রবণ হয়। ফাঁপা নল একটু চাপ পাইলেই ভাঙিয়া যায়। এই জন্য এ সকল জিনিসকে অতি সতর্কতার সহিত ব্যাবহার করিতে হয়। বাগানের গাছে জল দিবার জন্য যে সকল দীর্ঘ রবারের নল ব্যবহৃত হয়, বাহিরের আঘাতে সে গুলি যাহাতে হটাৎ নষ্ট হইয়া না যায়, তাহার জন্য মোটা তার স্প্রিংএর মত করিয়া তাহাদের চারিদিকে জড়াইয়া রাখা হয়। ধাক্কা লাগিলে এই তারই তাহা সামলাইয়া লয়। পতঙ্গের শ্বাসযন্ত্রে যে সকল নলিকা থাকে, সে গুলিকে রক্ষা করিবার জন্য ঠিক্ এই-প্রকারেই ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তারেরই মত এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম সূত্র নলিকার ভিতর স্প্রিংএর মত জড়ানো থাকে। কাজেই বাহিরের চাপে সহসা নলের কোন ক্ষতি হয় না।

মানুষ এবং অপর উচ্চশ্রেণীর জীবগণ নাসিকার ছিদ্রপথ দিয়া বায়ু টানিয়া লয়। কান্‌কাযুক্ত জলচর প্রাণীগণ বাহিরের জল

কান্‌কার ভিতর দিয়া চালাইয়া তাহাকেই আবার মুখ দিয়া বাহির করে। পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীর শ্বাসযন্ত্রের সহিত নাসিকা বা মুখ-বিবরের অণুমাত্র সম্বন্ধ নাই। ইহাদের দেহের পার্শ্বে কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র (Spiracles) থাকে। এই গুলি পতঙ্গের দেহস্থ নলিকাগুলির মুখ। বাহিরের বায়ু অনায়াসে এই সকল ছিদ্র-পথ দিয়া নলে প্রবেশ করিতে পারে। বায়ুমিশ্রিত ধূলিকণা প্রভৃতি কঠিন পদার্থ যাহাতে হঠাৎ দেহে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্যও প্রবেশপথে সুব্যবস্থা আছে। কতকগুলি পতঙ্গদেহের ঐ ছিদ্র পথগুলি এমন সুবিন্যস্ত লোমে আবৃত থাকে যে, কেবল বায়বীয় পদার্থ ব্যতীত অপর কোন পদার্থই নলে প্রবেশ করিতে পারে না; অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণাও ঐসকল সুসজ্জিত লোমে আটকাইয়া যায়।

বৃশ্চিক এবং কেন্দ্রী (কেন্নো) প্রভৃতি শতপদী প্রাণীগণ পতঙ্গ-জাতিভুক্ত নয়; কিন্তু তথাপি ইহাদের শ্বাসযন্ত্রে পতঙ্গের শ্বসযন্ত্রের অনুরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শত শত ক্ষুদ্র নলিকা ইহাদের দেহাভ্যন্তরে গুচ্ছাকারে পরিব্যাপ্ত থাকে। পার্শ্বস্থ ছিদ্রগুলির সাহায্যে নলে বায়ু প্রবেশ করিলে রক্ত অক্‌সিজেন্‌-যুক্ত হইতে আরম্ভ করে।

মক্ষিকাজাতীয় কতকগুলি প্রাণী জীবনের প্রথমাংশে যখন শুঁয়ো পোকার আকারে (Larval Condition) থাকে, তখন তাহাদিগকে প্রায়ই জলে বাস করিতে দেখা যায়। কান্‌কাই খাঁটি জলচর প্রাণীদিগের একমাত্র শ্বাসেন্দ্রিয়। সুতরাং মক্ষিকা স্থলচর প্রাণী হইলেও জলচর অবস্থায় উহার কান্‌কা (Gill) থাকাই সঙ্গত মনে হয়। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুসন্ধান করিয়া শিশু মক্ষিকাগুলির দেহে সত্যই কান্‌কা দেখিতে পাইয়াছেন। এই অবস্থায় মক্ষিকাশিশুগুলির দেহের দুই পার্শ্বে অতি পাত্‌লা এবং সূক্ষ্ম আঁশের মত কতক গুলি অংশ ধারাবাহিক সজ্জিত থাকে। সাধারণ মৎস্যের কান্‌কার তন্তুগুলিতে যেমন সর্ব্বদাই রক্ত প্রবহমান দেখা যায়, ঐ আঁশগুলির উপরে ঠিক্ সেই প্রকার রক্তস্রোত অবিরাম চলিতে থাকে। সুতরাং উহাকে কান্‌কারই রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। জল-মিশ্রিত অক্‌সিজেন ঐ আঁসের উপরকার রক্তের সংস্পর্শে আসিলেই তাহা দেহস্থ হইয়া পড়ে। মৎস্য প্রভৃতি জলচরগণ যেমন মুখবিবর হইতে অবিরাম জল বহির্গত করিয়া সর্ব্বদাই এক জল-প্রবাহ কান্‌কার উপর দিয়া চালাইতে পারে, মক্ষিকা-শিশুগুলির দেহে সে প্রকার ব্যবস্থা না থাকিলেও, তাহাদের পুচ্ছগুলি কান্‌কার উপর দিয়া জল চালাইবার অনেকটা সহায়তা করে। ইহাদের পুচ্ছে সাধারণতঃ পক্ষীর ডানার মত তিনটি অংশ থাকে। মক্ষিকাশাবকগুলি সর্ব্বদাই এই ডানা-গুলিকে আন্দোলিত করিয়া দেহের পার্শ্বস্থ সেই কান্‌কার উপর দিয়া অবিরাম জল প্রবাহ চালাইতে সক্ষম হয়।

মশক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীও শৈশবে জলচর অবস্থায় থাকে। কোন ক্ষুদ্র পাত্র বা নর্দ্দামা ইত্যাদির জল বহুদিন আবদ্ধ থাকিলে তাহাতে বড় বড় পিনের মত যে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণের চঞ্চল পোকা দেখা যায় সেই গুলিই শিশু মশক। লম্বা দেহটিকে ক্ষণে ক্ষণে নানা ভঙ্গিতে বক্র করিতে করিতে উহারা সর্ব্বদাই জলের ভিতর বিচরণ করে, এবং এক একবার জলের ঠিক উপরে উঠিয়া শ্বাসযন্ত্রটিকে

বায়ুতে পূর্ণ করিতে থাকে। ইহাদের দেহ পরীক্ষা করিলে কান্‌কার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। পতঙ্গদিগের দেহে যে নলিকাময় শ্বাসযন্ত্র (Spiracles) দেখা যায়, অনুসন্ধানে কেবল তাহারই অস্তিত্ব ধরা পড়ে। কাজেই বলিতে হয়, শৈশবে জলচর হইয়াও মশকগণ জলের অক্‌সিজেন্ গ্রহণ করে না; অক্‌সিজেনের জন্য আকাশের বায়ুর উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। এই কারণে শ্বাসযন্ত্রের নলিকাগুলিকে বায়ুপূর্ণ করিবার জন্য উহারা মাঝে মাঝে জলের উপরে ভাসিয়া উঠে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পতঙ্গজাতীয় প্রাণীর শ্বাসেন্দ্রিয়ে যে সকল নলিকা থাকে, তাহাদের কতকগুলির মুখ দেহের পার্শ্বে আসিয়া শেষ হয় এবং এই সকল ছিদ্রপথ দিয়া বায়ু প্রবিষ্ট হইলে নলগুলি বায়ুপূর্ণ হইয়া পড়ে। শিশু মশকের দেহ পরীক্ষা করিলে, ঐ প্রকার একটি মাত্র বায়ুপ্রবেশপথ তাহার পুচ্ছপ্রান্তে দেখা যায়। সুতরাং বলিতে হয়, শিশুকালে মশক কেবল পুচ্ছ দিয়াই শ্বাসকার্য্য চালায়। বায়ু গ্রহণ করিবার জন্য যখন মশকশিশুগুলি জলের উপরে উঠে, উহাদের পুচ্ছের ঐ কার্য্যটি তখন সুস্পষ্ট দেখা যায়। উহারা কখনই মস্তকগুলিকে জলের উপরে উঠায় না। বায়ুর আবশ্যক হইলে পুচ্ছের অগ্রভাগটিকে জলের উপরে রাখিয়া কিয়ৎকাল স্থিরভাবে ভাসিয়া থাকে, এবং তার পর সেই নলিকাগুলি বায়ুপূর্ণ হইলে, আবার নীচে নামিয়া নানা ভঙ্গিতে বিচরণ সুরু করিয়া দেয়।

জগতের নানা জাতীয় অসংখ্য প্রাণীমণ্ডলীর মধ্যে আমরা কেবলমাত্র কয়েকটির শ্বাসযন্ত্রের একটা মোটামুটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহাদেরই গঠনে যে বৈচিত্র্য এবং নিপুণতা দেখা গেল, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া যে এক মহাসঙ্গীত অবিরাম ধ্বনিত হইতেছে, তাহারি সহিত তাল রাখিয়া প্রত্যেক প্রাণীকে বিচরণ করিতে হয়। ইহাই প্রাণীর প্রাণিত্ব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রাণিত্ব রক্ষার জন্য কাহাকেও একটু মাত্র চেষ্টা করিতে হয় না। যে জগদীশ্বর সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সুনিপুণ হস্তে অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক কীটেরও শ্বাসপ্রশ্বাস আহারনিদ্রার সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। এই কারণেই জগৎ এত সুন্দর এবং আনন্দময়। জীবনরক্ষা এবং আনন্দের জন্য যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, প্রত্যেক প্রাণী তাহা নিয়তই অযাচিত ভাবে পাইতেছে। ইহাই বিধাতার আশীর্ব্বাদ।

মশা ও ম্যালেরিয়া।

বসন্ত কলেরার যেমন কীটাণু-বীজ আছে তেমনি ম্যালেরিয়ারও আছে। ইহারাই শরীরের রক্তে প্রবেশ করিয়া ম্যালেরিয়া ঘটায়। এই জীবাণুরা খুব তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি করে এবং দেখিতে দেখিতে শরীরের সমস্ত রক্তকে দূষিত করিয়া ফেলে।

কিন্তু ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ইহাদের অপেক্ষাও ভয়ের কারণ অ্যানোফিলিস্ (anopheles) নামক একপ্রকার মশা; ইহারাই ম্যালেরিয়া-দেবীর বাহন। এই সব মশারা ডিম ও শিশু অবস্থায় ঝাঁক বাঁধিয়া জলে থাকে, তার পর বড় হইলে বাহির হয়। ইহারা যখন কোন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর গায়ের রক্ত শোষণ করে, তখন সেই

শোষিত রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার জীবাণুও তাহাদের শরীরে প্রবেশ করে। মানুষের শরীরে এই সব জীবাণুরা যেমন বংশবৃদ্ধি করে, মশার শরীরেও তেমনি করে এবং উহাদের মধ্যে যাহারা একটু সবল, তারা মশার মুখের অগ্রভাগে স্থান লাভ করে। অন্যান্য মশাদের ন্যায় অ্যানোফিলিস্‌দের কোনো শব্দ নাই এবং ইহাদের কামড়েও কোনো যন্ত্রণা হয় না। কাজেই ইহাদের উপস্থিতি টের পাওয়া বড় কঠিন।

এই সব ম্যালেরিয়া-জীবাণুপূর্ণ মশা যখন আবার কোন সুস্থ লোককে কামড়ায়, তখন সেই মশার মুখ দিয়া ম্যালেরিয়ার জীবাণু তাহার রক্তে প্রবেশ করে এবং বংশবৃদ্ধি দ্বারা দেখিতে দেখিতে তার রক্তকেও দূষিত করিয়া ফেলে। এইরূপে দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই সেই ব্যক্তির জ্বর হয়।

পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল এবং এখনও অনেকের বিশ্বাস আছে যে ম্যালরিয়াক্রান্ত জল-বায়ুই ম্যালরিয়ার বিষে পরিপূর্ণ—কিন্তু সে কথা নাকি সর্ব্বৈব মিথ্যা। ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থানের জল বায়ু মাটি প্রভৃতি সমস্তই পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে এক মশা ও মানুষের শরীর ছাড়া আর কোথাও ম্যালরিয়া জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এক লোক হইতে আর এক লোকের শরীরে ম্যালরিয়া চালিত করিবার জন্য দূষিত জল বাতাস প্রভৃতি দ্বারা অনেকরূপ চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু এক অ্যানোফিলিস্ মশার সাহায্য ছাড়া আর কোনো উপায়ই সফল হয় নাই। এমন কি ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত রোগীর গা হইতে রক্ত লইয়া সেই রক্ত অস্ত্রের সাহায্যে সুস্থ লোকের গায়ে প্রবেশ করাইয়া দেখা গিয়াছে যে কেবল কয়েকটি মাত্র লোকের সম্বন্ধে এই উপায় সফল হইয়াছে।

পক্ষান্তরে অন্য সমস্ত উপায় বাদ দিয়া একমাত্র মশার কামড়ে ম্যালরিয়া হইতে দেখা গিয়াছে। ইংলণ্ডের জল বাতাসে ম্যালেরিয়ার নাম গন্ধও নাই। মশার কামড়ই ম্যালেরিয়ার একমাত্র কারণ কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য একবার সেখানকার একদল সম্পূর্ণ সুস্থ যুবক ইটালীর কোন ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থান হইতে মশা আনাইয়া নিজেদের দেহকে কামড়াইতে দেয়। কয়েকদিন পরে দেখা গেল তাহাদের সকলকেই ম্যালেরিয়া ধরিয়াছে।

অতএব ম্যালেরিয়ার হাত হইতে বাঁচিতে হইলে অগ্রে এই মশার জাতকে ধ্বংস করিতে হইবে। বড় মশাত একটা দুটা করিয়া মারা সম্ভব হইবে না—কাজেই শিশু অবস্থায় তারা যখন ঝাঁক বাঁধিয়া জলে থাকে, তখনি তাদের মারার বিশেষ সুযোগ। বাড়ীর আশে পাশে যেখানে যত ছোট ছোট ডোবায় জল জমিয়া শিশু মশকদের বাসস্থান হইয়াছে, সেই সব ড্রেনের জল বাহির করিয়া দিতে হইবে বা মাটি দিয়া বুজাইয়া ফেলিতে হইবে, অথবা সেই জমা জলের উপরে এতটা পরিমাণ কেরোসিন তেল ঢালিয়া দিতে হইবে যাহাতে সেই জলের উপর রীতিমত একটা তেলের সর পড়ে। ইহাতে বাতাসের অভাবে শিশু-মশকেরা নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইবে। তাহারপর সেই তেলেআগুণ লাগাইয়া দিলে আর কোনো ভয়ের কারণ থাকিবে না। বড় মশার হাত হইতে এড়াইবার জন্য মশারি ব্যবহার করিতে হইবে। এ সব সতর্কতা সত্বেও যদি ম্যালেরিয়া ধরে তাহা হইলে কুইনাইন খাইতে হইবে। কুইনাইন শরীরে প্রবেশ করিলে ম্যালেরিয়া-জীবাণুরা আর বংশবৃদ্ধি করিতে পারে না এবং যাহা থাকে তাও তাড়াতাড়ি

মরিয়া যায়। নিউগিনিয়া, ইটালী প্রভৃতি বিশেষ ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থানে কুইনাইন ব্যবহার করায় ম্যালেরিয়া প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে।

ম্যালেরিয়ার রোগীর নিকট হইতে সুস্থ লোককে স্থানান্তরিত করিতে পারিলে ভাল হয়, তাহা না হইলে ম্যালেরিয়াবহ মশার হাত এড়ান কঠিন। এই সব সতর্কতা কিছু ব্যয় ও শ্রমসাধ্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান গৃহস্থ তাহার তুলনায় ডাক্তার ও পথ্য খরচ এবং পরিবারের ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

বর্ত্তমান যুগ।

(বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কথিত)

আমি পূর্ব্বেই একটি কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি—তোমরা যে এই সময়ে জন্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছ, ইহা তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। তোমরা জান না এই কাল কত বড় কাল—ইহার অভ্যন্তরে কি প্রচ্ছন্ন আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পৃথিবীর ইতিহাসে যে এক নূতন পৃষ্ঠার রচনা করিতেছে, এমন পৃষ্ঠা খুব কমই রচিত হইয়াছে। হাজার হাজার শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীতে এমন শতাব্দী খুব অল্পই আসিয়াছে। বিশ্বাস কর, বর্ত্তমান শতাব্দী সমস্ত বিশ্বের মধ্যে এক মহা যুগান্তর আনিয়া দিবে—চারিদিকে আজ তাহারই সূচনা দেখিতেছি। কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবী জুড়িয়া এক উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়াছে। বিশ্ব-মানব প্রকৃতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছে—সবাই আজ জাগ্রত। পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করিবার জন্য সকল প্রকার অন্যায়কে চূর্ণ করিবার জন্য মানব মাত্রেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে—নূতন ভাবে জীবনকে দেশকে গড়িয়া তুলিবে। বসন্ত আসিলে বৃক্ষ যেমন করিয়া তাহার দেহ হইতে শুষ্ক পত্র ঝাড়িয়া ফেলে, নব পল্লবে সাজিয়া উঠে, মানব প্রকৃতি কোন্ এক প্রাণপূর্ণ হাওয়ায় ঠিক তেমনি করিয়া সাজিয়া উঠিবার জন্য ব্যাকুল। মানব-প্রকৃতি পূর্ণতার আস্বাদ পাইয়াছে, ইহাকে এখন কোনমতেই বাহিরের শক্তির দ্বারা চাপিয়া ছোট করিয়া রাখা চলিবে না। আসল জিনিসটা সহসা আমাদের চোখে পড়ে না, অনেক সময়ে এমন কি তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অস্বীকার করিয়া বসি। বাহিরের জিনিসটাই আমাদের চোখে বড় বলিয়া ঠেকে; এ কথা ভুলিয়া যাই মূল সত্য নিঃশব্দে গোপনে ধীরে ধীরে কার্য্য করিয়া থাকে। আজ আমরা বাহির হইতে দেখিতেছি চারিদিকে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত, যাহাকে আমরা পলিটিক্‌স (Politics) বলি। উহাকে যত বড় করিয়াই দেখি না কেন, উহা নিতান্তই বাহিরের জিনিষ। আমাদের আত্মাকে কিছুতে যদি জাগরিত করিতেছে সত্য হয়, তবে তাহা ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই নহে। এই ধর্ম্মের মূল-শক্তিটি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কাজ করিতেছে বলিয়াই আমাদের চোখে উহা ধরা পড়িতেছে না; পলিটিক্‌সের চাঞ্চল্যই আমাদের সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা উপরকার তরঙ্গটাকেই দেখিয়া থাকি, ভিতরকার স্রোতটাকে দেখি না। কিন্তু বস্তুতঃ ভগবান যে মানব-সমাজকে ধর্ম্মের ভিতর দিয়া একটা মস্ত নাড়া দিয়াছেন, ইহাই বিংশ শতাব্দীর বার্ত্তা। বিশ্বাস কর, অনুভব কর, উত্তর

দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আজ এই ধর্ম্মের বৈদ্যুতশক্তি ছুটিয়া চলিয়াছে—ইহা কল্পনার কথা নয়। পৃথিবীতে আজ যে-কোনো তাপস সাধনায় প্রবৃত্ত আছে, তাহার পক্ষে এমন অনুকূল সময় আর আসিবে না। আজ কি তোমাদের নিশ্চেষ্ট থাকিবার দিন? তন্দ্রা কি ছুটিবে না? আকাশ হইতে যখন বর্ষণ হয়, ছোট বড় যেখানে যত জলাশয় খনন করা আছে, জলে পূর্ণ হইয়া উঠে। পৃথিবীতে আজ যেখানেই কোনো মঙ্গলের আধার পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া আছে, সেখানেই তাহা কল্যাণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। সার্থকতা আজ সহজ হইয়া আসিয়াছে; এমন সুযোগকে ব্যর্থ হইতে দিলে চলিবে না। তোমরা আশ্রমবাসী এই শুভযোগে আশ্রমকে সার্থক করিয়া তোল। প্রস্তরের উপর দিয়া জলস্রোত যেমন করিয়া বহিয়া যায়, সেখানে দাঁড়াইবার কোনই স্থান পায় না, আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়া তেমনি করিয়া এই প্রবাহ যেন বহিয়া না যায়! প্রিয়তম আশ্রমকে প্রস্তুত করিয়া রাখ। ঈশ্বরের প্রসাদস্রোত আজ সমস্ত পৃথিবীর উপরদিয়া বিশেষভাবে প্রবাহিত হইবার সময় এখানে আসিয়া একবারটি যেন পাক খাইয়া দাঁড়ায়। সমস্ত আশ্রমটি যেন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। শুধু আমাদের এই ক্ষুদ্র আশ্রমটি কেন, ছোট বড় পৃথিবীর যেখানে যে কোন সাধনার ক্ষেত্র আছে মঙ্গল-বারিতে আজ পূর্ণ হউক। আশ্রমে বাস করিয়া এই দিনে জীবনকে ব্যর্থ হইতে দিও না। এখানে কি শুধু তুচ্ছ কথায় মাতিয়া হিংসা দ্বেষের মধ্যে থাকিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া দিন কাটাইতে আসিয়াছ? শুধু পড়া মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাশ করিয়া ফুটবল খেলিয়া এতবড় একটা জীবনকে নিঃশেষ করিয়া দিবে? কখনই না—ইহা হইতেই পারে না। এই যুগের ধর্ম্ম তোমাদের প্রাণকে স্পর্শ করুক। তপস্যার দ্বারা সুন্দর হইয়া তোমরা ফুটিয়া উঠ। আশ্রম-বাস তোমাদের সার্থক হউক। তোমরা যদি মনুষ্যত্বের সাধনাকে প্রাণপণ করিয়া ধরিয়া না রাখ, শুধু খেলা ধূলা পড়া শুনার ভিতর দিয়াই যদি জীবনকে চালাইয়া দাও, তবে যে তোমাদের অপরাধ হইবে, তাহার আর মার্জ্জনা নাই, কারণ তোমরা আশ্রমবাসী।

আবার বলি তোমরা কোন্ কালে এই পৃথিবীতে আসিয়াছ, ভাল করিয়া সেই কালের বিষয় ভাবিয়া দেখ। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ যুগ আসে নাই বলিলেই হয়। বর্ত্তমান কালের একটি সুবিধা এই—বিশ্বের মধ্যে যে চাঞ্চল্য উঠিয়াছে একই সময়ে সকল দেশের লোক তাহা অনুভব করিতেছে। পূর্ব্বে একস্থানে তরঙ্গ উঠিলে অন্য স্থানের লোকেরা তাহার কোনই খবর পাইত না। প্রত্যেক দেশটি স্বতন্ত্র ছিল। এক দেশের খবর অন্য দেশে গিয়া পৌঁছিবার উপায় ছিল না। মার্টিন লুথারের সময় সমগ্র য়ুরোপে যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে আমাদের দেশের মধ্য দিয়াও ধর্ম্ম-তরঙ্গ ছুটিয়াছিল। কিন্তু আমরা মার্টিন লুথারকে জানিতাম না, য়ুরোপও চৈতন্য দেবকে চিনিত না। দুই দেশকে একত্র দেখিবার কোন সুবিধাই ছিল না। এখন আর সেই দিন নাই। ঘরে বসিয়া দেশ বিদেশের খবর পাই। দেশের কোন স্থানে ঘা লাগিয়া তরঙ্গ উঠিলে সেই তরঙ্গ শুধু দেশের মধ্যে না—সমস্ত পৃথিবীর ভিতর দিয়া তীরের মত ছুটিয়া চলে। আমরা

সকলে এক হইয়া দাঁড়াই। কত দিক হইতে আমরা বল পাই; সত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিবার যে মহা নির্যাতন তাহাকে অনায়াসেই সহ্য করিতে পারি; নানাদিক হইতে দৃষ্টান্ত ও সমবেদনা আসিয়া জোর দেয়—একি কম কথা। নিজেকে অসহায় বলিয়া মনে করি না। এই তো মহা সুযোগ। এমন দিনে আশ্রম বাসের সুযোগকে হারাইও না। জীবন যদি তোমাদের ব্যর্থ হয়, আশ্রমের কিছুই আসে যায় না—ক্ষতি তোমাদেরই। আমি বিশ্বাস করি একদিন না একদিন আমাদের এই আশ্রম সার্থক হইয়া উঠিবেই। কোন না কোন মহাপুরুষ কঠিন সাধনার দ্বারা এই আশ্রমকে জগতের মধ্যে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবেন, এমন দিন আসিবেই; তবে দুঃখ এই আমরা কিছুই করিলাম না। গাছ ভরিয়া বউল আসে। সকল বউলেই যে ফল হয় এমন নয়। কত ঝরিয়া পড়ে, শুকাইয়া যায়, তবু ফলের অভাব হয় না। ডাল ভরিয়া ফল ফলিয়া উঠে। ফল হইল না বলিয়া গাছ দুঃখ করে না, দুঃখ ঝরা-বউলের, তাহারা যে ফলে পরিণত হইয়া উঠিতে পারিল না।

এই আশ্রম যখন প্রস্তুত হইতেছিল, বৃক্ষগুলি যখন ধীরে ধীরে আলোক দিকে মাথা তুলিয়া ধরিতেছিল, তখনও এই নূতন যুগের কোনই সংবাদ আসিয়া পৃথিবীতে পৌঁছায় নাই। অজ্ঞাতসারেই আশ্রমের ঋষি এই যুগের জন্য আশ্রমের রচনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তখনও বিশ্ব-মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই, শঙ্খ ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। বিংশ শতাব্দীর জন্য বিশ্ব-দেবতা গোপনে গোপনে কি যে এক বিপুল আয়োজন করিতেছিলেন, তাহার লেশমাত্রও আমরা জানিতাম না। আজ সহসা মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল—আমাদের কি পরম সৌভাগ্য। আজ বিশ্ব-দেবতাকে দর্শন করিতেই হইবে, অন্ধ হইয়া ফিরিয়া গেলে কিছুতেই চলিবে না। আজ প্রকাণ্ড উৎসব; এই উৎসব একদিনের নয়, দুই দিনের নয়—শতাব্দী-ব্যাপি-উৎসব। এই উৎসব কোন বিশেষ স্থানের নয় কোন বিশেষ জাতির নয়—এই উৎসব সমগ্র মানব-জাতির জগত-জোড়া উৎসব। এস আমরা সকলে একত্র হই, বাহির হইয়া পড়ি। দেশে কোন রাজার যখন আগমন হয় তাঁহাকে দেখিবার জন্য যখন পথে বাহির হইয়া আসি তখন মলিন জীর্ণ বস্ত্রকে ত্যাগ করিতে হয়, তখন নবীন বস্ত্রে দেহকে সজ্জিত করি। আজ দেশের রাজা নন সমগ্র জগতের রাজা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, নত কর উদ্ধত মস্তক। দূর কর সমস্ত বর্ষের সঞ্চিত আবর্জ্জনা। মনকে শুভ্র করিয়া তোল। শান্ত হও পবিত্র হও। তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া গৃহে ফের। তিনি তোমাদের শিরে আশীর্ব্বাদ ঢালিয়া দিন—মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন।

সুন্দরদাস।

সুখ-সমাধি।

খুলেছ জ্ঞানের দ্বার হে গুরু-গোবিন্দ!
ভক্তি ভরে বন্দি তব চরণারবিন্দ।
গোপী গেল যদি, গেল ভকতি চলিয়া,
যাহা ছিল পুরাতন সকলি লইয়া।
তক্র ত্যজি লহ ভাই নিঙাড়িয়া তত্ত্ব
ভোজনে পাইবে সুখ, স্বাদে অমৃতত্ব।
পশি হৃদে, তত্ত্বরস ঢাল অনিবার,
সুখে নিদ্রা যাবে দাস-সুন্দর তোমার।

হরিনামামৃত-কণা করিয়া সংগ্রহ
ছেদিয়াছি আন কর্ম্ম, আচার, আগ্রহ।
আত্মতত্ত্ব সুবিচার করি অনুক্ষণ
অনায়াসে কর্ম্মপাশ করেছি ছেদন।
পশি হৃদে, তত্ত্বরস ঢাল অনিবার
সুখে নিদ্রা যাবে দাস-সুন্দর তোমার।
আর কিছু কর্ম্ম মোর নাহি লাগে মনে
সহস্র বিতণ্ডা বাণী বরিষাও কাণে।
কেবা করে জপ, তপ, তীর্থ, দান, ব্রত,
উপাস নিয়ম যম যজ্ঞ হোম যত।
পশি হৃদে, তত্ত্বরস ঢাল অনিবার
সুখে নিদ্রা যাবে দাস-সুন্দর তোমার।
ইড়া কি পিঙ্গলা নাড়ী অন্য সুষমন (১)
ইহাতে কে যোগাভ্যাস করিবে এখন ?
কিছু দিন করে লোক আসন অভ্যাস
কিছু দিন যাপে রোধি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস
কিছু দিন কাটে লোক রাত্রি জাগরণে
উদাসী হইয়া ফিরে দেশ পর্য্যটনে।
পশি হৃদে, তত্ত্বরস ঢাল অনিবার
সুখে নিদ্রা যাবে দাস-সুন্দর তোমার।
ভিন্ন ভিন্ন মুনির বিভিন্ন মত হেরি
মোক্ষ ছাড়ি মনের দুয়ারে করে ফেরি,
বর্ণাশ্রমে ফিরে ফিরে সন্ন্যাসভিতর
ধর্ম্ম অর্থ লভি কাম প্রহৃষ্ট অন্তর।
কেন মিছে বকবাদ কাহারো সহিত,
মিথ্যা সব বচন, তাহাতে নাই হিত।
কেহ বা প্রশংসা করে স্তুতি বহু বিধি
কেহ নিন্দে নিদারুণ বাক্য-বাণ বিঁধি।
বুঝিলেই হয় সব সংশয় নাশ,
সমান করিয়া জানি গৃহ বনবাস।
কিছুতেই নহি বদ্ধ, মোহ, ভালবাসা,
নির্পক্ষ হইয়া হেরি বিশ্বের তামাসা।
পশি হৃদে, তত্ত্বরস ঢাল অনিবার
সুখে নিদ্রা যাবে দাস-সুন্দর তোমার।

(১) সুষুম্ন।

শরীরের চিন্তা করি কেন ? ভাবি তাই,
প্রারব্ধে যা আছে ঠিক আসিবে তাহাই।
স্বরগের নরকের সংশয় হেন,
গমন ও আগমন যম-ভয় কেন ?
শুন তত্ত্ব গুরু মুখে করহ মনন,
নিদিধ্যাসে কর পরে সময় ক্ষেপন।
কি আর বলিব অন্যে, কিবা আছে ফল,
খুলিয়া গিয়াছে মোর হৃদয়-কমল,
সহজে গিয়াছে মিটে ঘন অন্ধকার।
আলোকে উজ্জ্বল বাহ্য-অন্ত একাকার।
পশি হৃদে, তত্ত্বরস ঢাল অনিবার
সুখে নিদ্রা যাবে দাস-সুন্দর তোমার।
দেহ আত্মা ভিন্ন, দেহে আত্মার নিবাস,
উভে নাহি মিশে, যথা জড় ও আকাশ।
দেহ নিত্য উপজিয়া নিত্য হয় ক্ষয়,
অজর অমর আত্মা নাহি তার লয়।
যার অনুভব আছে, সেই তাহা জানে,
সে পায় পরমানন্দ হৃদি মন প্রাণে।
কস্তুরী কর্পূর দন্তে করিলে চর্ব্বণ,
অবশ্য প্রকাশে গন্ধ, কে করে গোপন।
বারিতে তুষার হয় তুষারেতে বারি,
আত্মা পরমাত্মা ভেদ এরূপ বিচারি
যথা নদী প্রবাহিয়া সাগরে মিলায়
ত্যজি দ্বৈত অদ্বৈত স্বভাব জীব পায়।
পশি হৃদে, তত্ত্বরস ঢাল অনিবার
সুখে নিদ্রা যাবে দাস-সুন্দর তোমার।
পূর্ণব্রহ্ম অখণ্ডিত হন অনাবৃত,
এ বিশ্বাস হইতে সংশয় অপহৃত ;
রজ্জুতে সর্পের ভ্রম সীসকে রজত
মৃগতৃষ্ণিকায় জল, তেমতি জগৎ।
দেখ, শুন, স্পর্শ কর, মুখে বল বাণী,
লহ ঘ্রাণ, অনাসক্ত থাকিবে আপনি।
উপরে উপরে হের জগতের ক্রিয়া
সাবধান! যেন তাহে না যাও মজিয়া।
হে গুরো! ভক্তির সহ এ উজ্জ্বল জ্ঞান
বহুরূপে এ অধমে করিয়াছ দান।

পশি হৃদে, তত্ত্বরস ঢাল অনিবার,
সুখে নিদ্রা যাবে দাস-সুন্দর তোমার।

সংগ্রহ।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

অভক্ষ্যপরিহারশ্চ সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।
আচারেষু ব্যবস্থানং শৌচ মিত্যভিধীয়তে॥

অভক্ষ্য দ্রব্য পরিহার, সাধুসঙ্গ, সদাচার, ইহাই শৌচ।

প্রশস্তাচরণং নিত্যং অপ্রশস্তবিবর্জ্জনং।
এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তং ঋষিভির্ধর্ম্মদর্শিভিঃ॥

প্রশস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, অপ্রশস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ, ইহাকেই ঋষিগণ মঙ্গল বলেন।

শরীরং পীডাতে যেন শুভেন ঘশুভেন বা।
অত্যন্তং তন্ন কুর্ব্বীত অনায়াসঃ স উচ্যতে।

শুভ কার্য্যই হউক, আর অশুভ কার্য্যই হউক, যাহা দ্বারা শরীর পীড়াযুক্ত হয়, তাহা অধিক করিবে না; ইহার নাম অনায়াস।

ন গুণান্ গুণিনো হন্তি স্তৌতি চান্যান্ গুণানপি।
ন হসেচ্চান্যদোষাংশ্চ সানসূয়া প্রকীর্ত্তিতা॥

গুণী ব্যক্তির গুণের অপলাপ না করা, সৎ গুণের প্রশংসা করা, অপরের দোষ দেখিয়া পরিহাস না করা, ইহারই নাম অনসূয়া।

যথোৎপন্নেন কর্ত্তব্যঃ সন্তোষঃ সর্ব্ববস্তুষু।
ন স্পৃহেৎ পরদারেষু সাস্পৃহা পরিকীর্ত্তিতা॥

যখন যাহা মিলিবে তাহাতে সন্তোষ, পরস্ত্রীতে অনভিলাষ, ইহাই অস্পৃহা।

বাহ্যমাধ্যাত্মিকং বাপি দুঃখমুৎপাদ্যতেহপরৈঃ।
ন কুপ্যতি ন চাহন্তি দম ইত্যভিধীয়তে॥

বাহ্য কারণে বা মানসিক কারণে দুঃখ উপস্থিত হইলে ক্রোধ বা প্রতিহিংসা না করার নাম দম।

অহন্যহনি দাতব্যমদীনেনান্তরাত্মনা।
স্তোকাদপি প্রযত্নেন দানমিত্যভিধীয়তে॥

আয় অল্প হইলেও প্রতিদিন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অক্ষুব্ধ চিত্তে অপরকে দিবে, ইহার নাম দান।

পরস্মিন্ বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্যে রিপৌ তথা।
আত্মবৎ বর্ত্তিতব্যং হি দয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা॥

পরের প্রতি, বন্ধুবর্গের প্রতি, শত্রু, মিত্র ও দ্বেষের পাত্রের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহারের নাম দয়া।

শৌচমঙ্গলানায়াসা অনসূয়াস্পৃহাদমঃ।
লক্ষণানি বিপ্রস্য তথা দানং দয়াপি চ।

এই শৌচ, মঙ্গল, অনায়াস, অনসূয়া, দম, দান ও দয়া, ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

অত্রিসংহিতা।

ব্রহ্মতত্ত্বং নজানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

যে ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না, অথচ উপবীতের জন্য গর্ব্ব করে, সেই ব্রাহ্মণ এই পাপে পশু বলিয়া বিদিত।

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ ক্রিয়াহীন, মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্ম বিরহিত, নির্দ্দয়, সে চণ্ডাল বলিয়া গণ্য।

অত্রিসংহিতা।

ব্রাহ্মণাদির বৃত্তি।

ব্রাহ্মণস্য যাজনপ্রতিগ্রহৌ, ক্ষত্রিয়স্য ক্ষিতিত্রাণম্, কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যকুসীদযোনিপোষণানি বৈশ্যস্য; শূদ্রস্য সর্ব্বশিল্পানি। আপদ্যনন্তরা বৃত্তিঃ।

ব্রাহ্মণের জীবিকালাভের উপায় যাজন ও প্রতিগ্রহ; ক্ষত্রিয়ের জীবিকা রাজ্য-পালন; বৈশ্যের জীবিকা কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, সুদগ্রহণ, ধান্যাদি বীজ রক্ষা। শূদ্রের জীবিকা সর্ব্ববিধ শিল্প। সমূহ বিপদ উপস্থিত হইলে পরপর বৃত্তিগ্রহণে বিশেষ দোষ নাই। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বৃত্তি, ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৃত্তি এবং বৈশ্য শূদ্র বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন।

বিষ্ণুসংহিতা।

ক্রমশঃ।

নানা কথা।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সভা।—বিগত পূজার অবকাশ উপলক্ষে বরোদায় উক্ত সভা আহূত হয়। মহারাষ্ট্রীয় ভাষার উন্নতি বিধানই এই সভার উদ্দেশ্য। বরোদা মহারাজার অনুগ্রহ লাভ করিতে এই সভা সমর্থ হইয়াছে। এবারকার অধিবেশনে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা ও অক্ষর কি হওয়া উচিত, তাহা ও আলোচিত হইয়াছিল। দেবনাগরী অক্ষর ও হিন্দী ভাষা সাধারণ রূপে পরিগৃহিত হইবার উপযোগী, অনেকেই এইরূপ মত দেন। ভারতের প্রায় বার তের কোটি লোক দেবনাগরী অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকে। ডাক্তার ভাণ্ডারকর অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। সুবোধ পত্রিকা।

বাইবেল।—চারিশত আঠারটি ভাষায় বাই-

বেল অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। ধন্য অধ্যবসায়। Christian life, september.

মহর্ষির আত্মজীবনী।—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এস, মহোদয় কর্তৃক উক্ত গ্রন্থ ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। মহর্ষিদেবের বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি ছবি ও তাঁহার পরিবার বর্গের মধ্যে অনেকের ছবি উহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। মহর্ষির আত্ম-জীবনী কেবলমাত্র বঙ্গভাষায় থাকায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা উহার ইংরাজি অনুবাদ দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ হইল। সত্যেন্দ্র বাবু উক্ত পুস্তকের ভূমিকায় অন্য যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই গবেষণা পূর্ণ। পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে এবং উহাতে এক মহৎ অভাব বিদূরিত হইয়াছে। পুস্তকের মূল্য আড়াই টাকা মাত্র এবং উহা আদি-ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য।

সমালোচনা। শেখ মোহম্মদ জমীরুদ্দীন সাহেব নিজকৃত দুইখানি গ্রন্থ সমালোচনার জন্য আমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন। প্রথমখানির নাম ইসলামী বক্তৃতা। ইহা ইংরাজি হইতে অনুবাদিত। যে সকল বক্তা অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত ইসলাম ধর্ম্মের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে টেলার সাহেব বলিয়াছেন যে "সত্যবাদিতা এবং আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ইসলামের সহচর। মন্দ কাজ হইতে দূরে রাখিবায় এবং জাতিকে সুসভ্য করিবার ক্ষমতা ইহার অতি অদ্ভুত। দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম "ইসলামের সভ্যতা সম্বন্ধে পরধর্ম্মাবলম্বিদিগের মন্তব্য।" ইহাতে হিতবাদী, সঞ্জীবনী, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি সংবাদপত্রের কয়েকটি প্রবন্ধ এবং কয়েকজন বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তির অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত গোলাপ চন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, ডি-এল, মহাশয় বাঙ্গালা ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষায় সুপণ্ডিত। ইহাঁর মত আমরা সাদরে উদ্ধার করিতেছি। তিনি বলেন—"আরবী ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য গ্রন্থ আল-কোরাণ বা কোরাণ শরিফ, অন্য নাম ফোরকান বা মোছাহেব। ইহা জগতের এক অপূর্ব্ব পদার্থ, অদ্ভুত ও অমূল্য গ্রন্থ। ইহা পড়িবার পড়াইবার, শিখিবার শিখাইবার গ্রন্থ বটে। আমি নিজে হিন্দু, কিন্তু হিন্দু হইয়াও এ গ্রন্থের শতমুখে প্রশংসা করিতে পারি। কোরাণ এক মহামূল্য রত্ন। এ রত্ন যে না দেখিয়াছে, ধর্ম্ম জগতে তাহার এখনও সম্পূর্ণ অধিকার হয় নাই। যাহারা কোরাণকে 'বদমায়েসের কল্পিত উপন্যাস" বলে তাহারা রজক-বাহকের সহিত সখ্যতা করিতে পারেন; ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু বা সাহিত্যপ্রিয় ভদ্রলোকের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ না থাকাই ভাল। কোরাণের সমগ্র বিষয় কাঠোর আরব্য ভাষায় লিখিত। ভাবের বেশ তরঙ্গ আছে, ভাষার বেশ উচ্ছ্বাস আছে, পাণ্ডিত্যের ছটা খুব দেখা যায়, ব্যাকরণের বাঁধুনী খুব মজবুত, এবং শব্দ-বিন্যাসের চাতুর্য্য ও অলঙ্কারের সংযোজনা বড়ই সুন্দর, বড়ই কৌতুহলময়। সমুদয় কোরাণ-সাগরে এক অপূর্ব্ব বীরত্ব ব্যঞ্জক তেজের লহরী ছুটিতেছে। সেই তেজে এখনও যবন জাতি বাঁচিয়া আছে।" ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারক সেখ মহাশয় এই মন্তব্যগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ইহা পাঠে যদি হিন্দুগণের চক্ষু মুসলমান-সাহিত্যে মুসলমান-ধর্ম্মের প্রতি উন্মোচিত হয় এবং তাহার সত্যের প্রতি অভিনিবেশ জন্মিয়া মনের সংস্কার ও ঘৃণা তিরোহিত হয়, তবে হিন্দু-মুসলমান-নিবসিত ভারতবর্ষের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। পক্ষান্তরে মুসলমান ভ্রাতৃবর্গের প্রতিও আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে তাঁহারাও হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর সাহিত্য এবং বেদ উপনিষদাদি গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিতে অভ্যাস করুন, হিন্দুর আচার ব্যবহারের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করুন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও হৃদয় হইতে হিংসা ঘৃণা দূরীভূত হইয়া ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হইবে, বসতি শান্তিময় হইবে, দেশ মধুময় হইবে। বলা বাহুল্য আমরা যখনই পারি মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ত্রুটি করি না। ইতিপূর্ব্বে হজরত মহম্মদের জীবনের প্রথমাংশ এই পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। সেখসাদির অমূল্য উক্তির সারাংশের অনুবাদও পত্রিকায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৩০১ সালের ২১ আশ্বিন লেখককে এই বলিয়া উপদেশ দেন,

"যে সমাজেই থাক, ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভক্তি কর, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর, তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য কর, তাঁহাকে ডাকিয়া আরাধনা কর, তাহা হইলে তোমার মুক্তি হইবে। মাকে কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিলে তিনি যেমন কোলে তুলিয়া লন, তদ্রূপ ঈশ্বরের নিকটে কাঁদ, তিনিও তোমাকে কোলে তুলিয়া লইবেন।

মহর্ষি এই বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন;
"ঈশ্বর তোমাকে মুক্তি দিউন ও আশীর্ব্বাদ করুন।"

পাঠক! উপরোক্ত উপদেশটি যদিও ক্ষুদ্র, কিন্তু চিন্তা করিলে দেখা যায়, যে বিশেষ সার কথা উহার মধ্যে নিহিত আছে। তিনি কোন সম্প্রদায়ের লোককে ঘৃণা করিতেন না, সকলকেই আদর করি

তেন ও উপদেশ দিতেন। এক ঈশ্বরের কথা ব্যতীত অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন না, ইহাই তাঁহার মহত্বের লক্ষণ ছিল।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, শ্রাবণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় ... ... ২৬৩।/০
পূর্ব্বকার স্থিত ... ৩৬৬৬॥/৯

সমষ্টি ... ৩৯২৯৸৶৯
ব্যয় ... ৩৯২॥৶০

স্থিত ৩৫৩৭। ৯

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাতকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৯৩৭।৯

৩৫৩৭।৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ২০০৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত
২০০৲

২০০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ১৲
পুস্তকালয় ... ২১৸৵০
যন্ত্রালয় ... ৩৬॥৶০
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন ৩৸ ০

সমষ্টি ... ২৬৩।/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ১৫৬৶৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৩০।৵
পুস্তকালয় ... ৭৸৶
যন্ত্রালয় ... ১৮৫৸৵৩
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন ১২ ৵৬

সমষ্টি ... ৩৯২॥৶০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, ভাদ্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় ... ৪৯৭॥/
পূর্ব্বকার স্থিত ... ৩৫৩৭। ৯

সমষ্টি ... ৪০৩৪৸/৯
ব্যয় ... ৮৭১৸/৬

স্থিত ... ৩১৬৩৻৩

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৫৬৩ ৻৩

৩১৬৩৻৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ২৬০৲

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসিক দান
২০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ২০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ মিত্র ২০৲

ডাক্তার,আর, সেনের সহধর্ম্মিণী ১০৲

বামাচরণ বসুর শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রাপ্ত ২৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী ৮৲

২৬০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩১৸৵০
পুস্তকালয়	...	১১৸৵০
যন্ত্রালয়	...	১৮৪॥৵০
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৯৲
সমষ্টি	...	৪৯৭॥/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৬৮৯ /৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮৷৶৬
পুস্তকালয়	...	৪৸/৩
যন্ত্রালয়	...	১৪৩৸৶৩
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৫॥ ৯
সমষ্টি	...	৮৭১৸/৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, আশ্বিন মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫৪০॥৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩১৬৩ ৫৩
সমষ্টি	...	৩৭০৩॥৶৩
ব্যয়	...	৬১৭॥ ৯
স্থিত	...	৩০৮৬ /৬

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৪৮৬ /৬

৩০৮৬ /৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ৪১৪৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এষ্টেটের
ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে
পাওয়া যায় ... ২০০৲

বণ্ডেড্ অয়ার হাউস সেয়ারের
ডিভিডেণ্ড বাবৎ।

শ্রীনরনাথ মুখোপাধ্যায় ২১০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীবনমালী চন্দ্র ১৲

নববর্ষের দান।

শ্রীচন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত ৩৲

৪১৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৮॥৶০
পুস্তকালয়		৭॥৶০
যন্ত্রালয়	...	৭৮৷ ০
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		২৶০
সমষ্টি	...	৫৪০॥৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩৩৪৸৶৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৬২ /৯
পুস্তকালয়	...	১৯॥/৬
যন্ত্রালয়	...	২০০৸৶৩
সমষ্টি		৬১৭॥ ৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০।

৭৯৭ সংখ্যা | ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।"

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ষট্পঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

জানাম্যহং সেবধিরিত্যনিত্যং
নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম পুনঃপুন এই কথাই বলেন যে, ধন রত্নাদি সকলই অধ্রুব পদার্থ, ইহা আমি বেশ জানি, এই অধ্রুব অনিত্য পদার্থের বিনিময়ে অথবা এই অধ্রুব অনিত্য পদার্থের সেবা স্তুতি দ্বারা সেই নিত্য সত্য পদার্থের লাভ কদাপি হয় না। যাহা ক্ষয়শীল তাহা অধ্রুব এবং যাহা অক্ষয় তাহাই ধ্রুব। ভ্রাতৃগণ! যখন দেখি যে, এই আমার গৃহ, এই আমার উদ্যান, এই আমার স্ত্রী পুত্রাদি, ইহাদের এত যে অভাব, আমি সে অভাব কিছুতেই পূর্ণ করিতে পারিতেছি না, তখন কাহার না মর্ম্ম পীড়া উপস্থিত হয়? আমরা দিন রাত সেই অভাবের প্রতীকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। এমন কি, আবশ্যক হইলে জীবন বিসর্জ্জনও করিতে পরাঙ্মুখ হই না, কিন্তু জীবন বিসর্জ্জন কালে ইহা কি একবার ভাবি যে, কাহার প্রদত্ত জীবন বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছি—এ জীবনদাতা কে? এ জীবনের উদ্দেশ্যই বা কি? আর যাহার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছি, আমার জীবন বিসর্জ্জনে সে কি রক্ষা পাইবে? সে কি চিরন্তন সম্পদ, চির শান্তি এবং অমৃত-জীবন লাভ করিতে পারিবে? তাহাই যদি হইত, তবে—

"যদুপতেঃ কঃগতা মথুরাপুরী
যদুপতির মথুরাপুরী কোথায় গেল?
রঘুপতেঃ কঃ গতোত্তরকোশলা"
রঘুপতির উত্তর কোশল কোথায় গেল?

এক দিন পূর্ণিমা-সম্মিলনে হেমচন্দ্র গাহিয়াছিলেন, "হে বঙ্কিম সখে তোমরাও সবে; কালেতে বিলীন হইবে এ ভবে। নাম গন্ধ যশ কিছুই না রবে, কালেতে সকলি হইবে হারা।" সে বঙ্কিমও আর নাই, সে হেমচন্দ্রও নাই। এই অল্প দিনেই সব ফুরাইয়াছে।

আমি এক দিন দীল্লি গিয়াছিলাম। কিন্তু দীল্লি-দর্শন আমার উদ্দেশ্য ছিল না—আমার উদ্দেশ্য হস্তিনাপুর দর্শন; যেখানে এক দিন পাণ্ডুবংশীয় মহাপ্রতাপশালী হিন্দু রাজগণের বিজয়-কেতন দিগন্ত উজ্জ্বল করিয়া প্রোথিত ছিল।

দীল্লি হইতে তিন ক্রোশ পদব্রজে শুষ্ক কণ্ঠে গমন করিয়া দেখিলাম কি ? দেখিলাম, তৃণ গুল্মবিহীন দূরান্তব্যাপী প্রস্তর-স্তূপ মাত্র হা হা করিতেছে, আর পৃথ্বীরাজ-কন্যার সেই সাধের মিনার বিষাদতপ্ত মস্তক দিয়া ঊর্দ্ধে মরীচি জ্বালা উৎক্ষেপ করিতেছে ! বায়ু শন্‌শন্‌ করিয়া অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে ? আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া চলিয়া আসিলাম। ভাবিলাম হিন্দুর পরিণাম তো এই—এখন একবার লোকে যাঁহাকে দীল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা বলে, তাঁহার কীর্ত্তি দেখিব। জনৈক পথিক বলিয়া দিল, আগ্রার নিকটে সেকেন্দ্রায় যাও। আমি এস্থান হইতে সেকেন্দ্রা-তীর্থে প্রস্থান করিলাম। দেখিলাম ঐখানে বহুবিশ্রুত বাদশাহ আকবরের সমাধিমন্দির। এই মন্দিরের তিন দিকে বৃহৎ বৃহৎ তিনটি দ্বার। উত্তরে কিছু দূরে শ্যাম সলিলা যমুনা প্রবাহিতা। শ্বেত ও লাল প্রস্তর দ্বারা এই সমাধি গৃহ পাঁচ স্তরে নির্ম্মিত হইয়া গগণ স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান। প্রাচীরে বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট প্রস্তরের কারুকার্য্য, এখন মলিন। মধ্যে সেই ধীসম্পন্ন পুরুষের মৃত-দেহ অন্ধকারে নিঃশব্দে কাল যাপন করিতেছে। দক্ষিণ দ্বারের দ্বিতীয় তলে রাজা মানসিংহ প্রভৃতি বারগণের নিকেতন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। সম্মুখের তোরণ হইতে সমাধি মন্দির পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত প্রস্তরময় পথ। এই পথের মধ্যভাগে জলের আধার ও পার্শ্বে পুষ্পের উদ্যান। প্রকাণ্ড ইহার অট্টালিকা, প্রকাণ্ড দ্বার, প্রকাণ্ড প্রাচীর এবং বিশাল ক্ষেত্রে সুবৃহৎ পুষ্পোদ্যান। এখানে বাদসাহের ঐশ্বর্য্য এখনো সকলই বর্ত্তমান, কেবল সেই বাদসাহ ও বাদসাহী-প্রতাপ আর নাই—সে এখন চিরঘুমন্ত। সে আর জাগিবে না, কিন্তু তাহার যে বিষয় ভোগের প্রবল তৃষ্ণা, তাহা এই বিনাশের মধ্যে চিরজাগ্রত রহিয়াছে।

পল পল ছীজে দেহ যহ।
ঘটত ঘটত ঘটি যাই ॥
সুন্দর তৃষ্ণা না ঘটে।
দিন দিন নৌতন ভাই ॥
নিত নিত ডোলে তাকতী।
স্বর্গ মৃত্যু পাতাল ॥
সুন্দর তিনোঁ লোকতে।
ভর‍্যো ন একো গাল ॥
সুন্দর তৃষ্ণা করত হ্যৈ।
সবকো বাঁধি গুলাম ॥
হুকুম করে তোঁহী চলে।
গিনত শীত নহি ঘাম ॥
সুন্দর তৃষ্ণাকে লিয়ে।
পরাধীন ভৈ যাই ॥
দুঃসহ-বচননিকো সহে।
যো পরহাত বিকাই ॥

পলে পলে এই দেহ বিনষ্ট হইতেছে—কমিয়া কমিয়া কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু হে সুন্দর ! তৃষ্ণা তো কমিতেছে না—সে দিন দিন নূতন হইয়া উঠিতেছে। শরীরের বল একদিকে কমিতেছে, তৃষ্ণার বল আর দিকে বাড়িতেছে। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই তিন লোক তাহার মুখে ফেলিয়া দাও, কিন্তু তাহার একগালও তাহাতে পূর্ণ হইবে না। হে সুন্দর ! তৃষ্ণা সকলকে বন্ধন করিয়া গোলাম প্রস্তুত করিতেছে। সে গোলাম হুকুম অনুসারেই গমনাগমন করিয়া বেড়ায়। তাহার শীত গ্রীষ্ম বোধ নাই। এক তৃষ্ণারই জন্য লোক পরাধীন হয়। সেই ব্যক্তিই দুঃসহ বাক্যজ্বালা সহ্য করে, যে পরহস্তে বিক্রীত।

সুন্দর দেহ মলিন অতি।
বুরি বস্তকো ভৌন ॥

হাড় মাঁসকো কোথরা।
ভনী কহে তিহি কৌন॥
সুন্দর পঞ্জর হাড়কো।
চাম লপেট্যো তাহি॥
তামে বৈঠ্যো ফুলিকে।
মো সমান কো আহি॥
সুন্দর স্থাবে বহুতহী।
বহুত করে আচার॥
দেহ মাহি দেখে নহি।
ভর্যো নরক ভণ্ডার॥

হে সুন্দর! এই দেহ অত্যন্ত মলিন এবং ইহা কদর্য্য বস্তুর ভাণ্ডার। ইহা হাড়-মাংসে জড়িত, ইহাকে ভাল কে বলে? সুন্দর, চর্ম্মবেষ্টিত অস্থিপঞ্জরের মধ্যে উপবেশন করিয়া গৌরব-ভরে মনে করিতেছ যে আমার সমান আর কেহ নাই। লোক স্নানাদি করিয়া কত প্রকার আচার করিতেছে, কিন্তু তাহার দেহের মধ্যে যে নরক ভাণ্ডার রহিয়াছে, তাহার দিকে দৃষ্টি নাই।

আমি পুরাতন পুষ্পবৃক্ষের ছায়াতে প্রস্তর-পথের উপরে বিশ্রাম করিতে বসিলাম—দক্ষিণ হইতে মলয়-মারুৎ ধীরে ধীরে আমার কর্ণ-রন্ধ্রে বলিয়া গেল—

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে,
একোহনুভুংক্তে সুকৃতং একএবতু দুষ্কৃতং॥

দেখিলাম তো অধ্রুব পদার্থের এই অবস্থা। এই অধ্রুব পদার্থের দ্বারা যাঁহারা সুখ-শয্যা রচনা করেন, তাঁহারা অধ্রুব গতিই প্রাপ্ত হন। ধ্রুবগতি লাভের জন্য সেই ধ্রুব পুরুষেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। সেই ধ্রুব পুরুষ কে এবং তিনি কি? ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ
সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং অন্য তাবৎ পদার্থ হইতে প্রিয় এই অন্তরতর পরমাত্মা। তিনিই তোমাকে এই অধ্রুব তাবৎ পদার্থ ভোগের জন্য দিয়াছেন, তুমি ভোগ কর কিন্তু তাহাতে মুগ্ধ হইও না। মুগ্ধ হইবার বস্তু সেই চির সুন্দর, চির শান্তিময়, চিরসত্য চিরমঙ্গলময় সনাতন সৎ। এই সনাতন সৎই চিরসুন্দর, চিরশান্ত, চিরমঙ্গল ও সত্য। তিনিই অন্তরতর অন্তরতম পরমাত্মা। এই অন্তরতম পরমাত্মার শরণাপন্ন হইতে হইলে তাঁহার সহিত যোগ নিবদ্ধ করিতে হয়। বলিলাম, যোগ নিবদ্ধ করিতে হয়। তবে এখন কি আমি তাঁহার সহিত যোগে নিবদ্ধ নহি? অবশ্য আছি। তবে কথা এই যে, যখন আমি আমার এই অবস্থা জানিব, বুঝিব, তখনই যোগ নিবন্ধন সিদ্ধ হইবে। মানবের পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ-তত্ত্বে অজ্ঞানতাই বন্ধন, তদ্‌জ্ঞানই যোগ ও মুক্তি।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।

বেদ বলিতেছেন যে, এই শরীরের অভ্যন্তরে দুইটি অশরীর উপলব্ধি স্থান আছে—তাহা আপনাকে আপনি জানিতেছে, এই আপনাকে আপনি জানাই তাঁহার স্থিতি-প্রতিষ্ঠা, কিম্বা বল যে—ইহাই তাঁহার সত্তা। এই যে দুইটি সত্তা তাহার একটি অপরিমিত ভূমা, আর একটি পরিমিত কর্ম্মফল ভোক্তা। অহং প্রত্যয়সিদ্ধ —অহং প্রত্যয়-প্রতিষ্ঠিত এই দুই জ্ঞানবিন্দু একত্র থাকিয়াই একজন সংসারে কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে, অপর পুরুষ ভোগহীন নিষ্কলঙ্ক সাক্ষীরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই সাক্ষী পরমাত্মাকে ভুলিয়া যখন এই ভোক্তা জীবাত্মা কেবল বিষয়-সুখ সাধনার্থে সংসারে নিমগ্ন হয়, তখন তাহার পদে পদে শোক হয়; কিন্তু যখন এই জীবাত্মা তাহার হৃদ্গত প্রীতি-

কুসুমে পরমাত্মার পূজা করে ও এই জগতস্থ তাঁহার মহিমাকে দেখে এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সাধন করে, তখনি ঈশ্বরকে দেখে, দেখিলে তখন আর শোক থাকে না, পরমানন্দ অনুভব হয়, প্রেমের বিমল জ্যোৎস্না প্রকাশিত হয়।

সাকি বরু এ বাদা * বরাফরোজ জাম মা
মংরব বগো কে কার জাহাঁ সুদ্ বকাম মা।
মা দর পিয়ালে অক্‌স রুখে ইয়ার দীদয়ম্
এয়ায় বেখবর জ লজ্জতে সোরব মদাম মা।

হে পথ প্রদর্শক, প্রেমের জ্যোৎস্নাতে আমার হৃদয় আলোকিত হইয়াছে। রে বন্দী, তুমি এই কথাই বল যে, জগতের কর্ম্মই আমার কর্ম্মে নিষ্পন্ন হউক। আমার হৃদয়ের মধ্যে আমার সেই চিরবন্ধুর সুন্দর মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিতেছি। রে বেহুঁস, সর্ব্বদা আমি যে এই কথাই বলিতেছি, তাহার মর্ম্মের প্রতি তুমি কর্ণপাত করিতেছ না?

তুমি বলিতেছ যে, ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসান না হইলে মানুষ বন্ধনমুক্ত হইতে পারে না। পরমানন্দ উদ্ভব হয় না। ইহা কেবল শাস্ত্রের উক্তি নহে, ইহা হিন্দুর হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় মজ্জায়, বিশ্বাসে বিশ্বাসে প্লাবিত রহিয়াছে। আমি এই শাস্ত্রের কথার এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু না বলিয়া অন্য একটি শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিতেছি—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না; প্রত্যুত ঘৃত-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধিই হইতে থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্মই যদি আদি হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের নিয়ামক হয় এবং ভোগের দ্বারাই ভোগের অবসান ও তৃপ্তি হয়, তবে শাস্ত্রান্তরে কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না, এ কথা কেন আসিল? আর শ্রীকৃষ্ণ কেনই বা এ কথা বলিলেন যে, যেরূপ ধূম সকল অগ্নিকে আচ্ছাদিত করে, যেমন দর্পণ উপরিস্থ মলের দ্বারা আবৃত হয় এবং যেমন জরায়ু নামক গর্ভবেষ্টন-চর্ম্মদ্বারা গর্ভ সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই জ্ঞান কামের দ্বারা আবৃত হয়। জ্ঞান অর্থে এখানে জ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মা-বিন্দু বুঝিতে হইবে। পুনরায় কেন বলিলেন যে, এই জ্ঞান কামের দ্বারা আবৃত হয়। ভোগকালেও অনর্থ অনুসন্ধান হেতু ঐ কাম দুঃখের কারণ হয়, এইজন্য কাম জ্ঞানীদিগের নিত্য শত্রু। ইহা কখন তৃপ্ত হয় না এবং ইহা অনলের ন্যায় সন্তাপজনক। বিষয় দর্শন শ্রবণাদি হেতু কামের উৎপত্তি হয়, এই জন্য ইন্দ্রিয় সকল এবং মন আর বুদ্ধি ঐ কামের আধারস্বরূপ কথিত হইয়াছে। ইহা ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। অতএব ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া পাপস্বরূপ কামকে নষ্ট কর, কারণ ঐ কাম আত্মবিষয়ক যে জ্ঞান এবং শাস্ত্রোক্ত যে বিজ্ঞান তদুভয়ের বিনাশক হয়। পুরুষ হইতেছে কামময় এবং এই কামনাই কর্ম্মের উদ্ভব করে। মনুষ্য কায়মনোবাক্যে যে কর্ম্ম করে তাহা ন্যায্য বা বিপরীত হউক এই কামনাই তাহার প্রবর্ত্তক। অতএব পুরুষের উচিত বিবেক বুদ্ধি দ্বারা কামনাকে সংযত রাখিয়া সাধু কার্য্যে তাহাকে নিয়মিত করিবেক। কর্ম্ম তিন প্রকার— সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, যে কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যরূপে বিহিত; অভিনিবেশ শূন্য, রাগদ্বেষরাহিত্যে কৃত এবং নিষ্কাম

* বাদা শব্দের অর্থ সুরা, কিন্তু দেওয়ান হাফেজ ইহা প্রেম অর্থে ব্যবহার করিতেন।

কর্ত্তা কর্তৃক কৃত, সেই কর্ম্ম সাত্বিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যে কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষী সাহঙ্কার ব্যক্তি কর্তৃক কৃত, যাহা বহ্বায়াসকর, সেই রাজস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যাহা ভাবী শুভাশুভ, বিত্ত ক্ষয়, হিংসা, পরপীড়া ও পৌরুষকে অপেক্ষা না করিয়া এবং আপনার সাধন-সামর্থ্যকে বিচার না করিয়া মোহপ্রযুক্ত আরব্ধ হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত হয়। যিনি অভিনিবেশ শূন্য, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য ও উৎসাহযুক্ত এবং আরব্ধ কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে বিকারশূন্য, এবম্ভূত অনুষ্ঠান-কর্ত্তা সাত্বিক বলিয়া কথিত হন। যিনি পুত্রাদিলাভার্থী, কর্ম্মফলকামী, লুব্ধ, হিংস্রক অশুচি এবং হর্ষশোকযুক্ত সেই অনুষ্ঠান কর্ত্তা রাজস বলিয়া অভিহিত হন। অনভিহিত, বিবেকশূন্য, উগ্র, শঠ, পরের অপমানকারী, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী সেই অনুষ্ঠান-কর্ত্তা তামস বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ইহাদের গতিও ভিন্ন ভিন্ন। তামস পুরুষের গতি তমসাচ্ছন্ন লোকেই হয়, রাজসের গতি রজঃপ্রধান লোকে হয় এবং সাত্বিকের গতি পুণ্যলোকে হয়। কর্ম্মজন্য জীবের যে লোকেই গতি হউক, তাহা তো তাহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে না। কর্ম্মই যদি মনুষ্যের বন্ধনের কারণ হয়, তবে কর্ম্মক্ষয় করিতে না পারিলে বন্ধন হইতে মুক্তি নাই। দেখিতে হইবে যে কর্ম্মক্ষয় কিসে হয়। গীতা বলিতেছেন যে—

> যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎকুরুতেঽর্জ্জুন।
> জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্তুপাকার কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, আত্মজ্ঞান রূপ অগ্নি সেইরূপ সকল কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। চিত্তশুদ্ধির যত প্রকার শাস্ত্রসম্মত উপায় আছে তাহাদের মধ্যে আত্মজ্ঞানের তুল্য উপায় আর কিছুই নহে। এই আত্মজ্ঞান স্বয়ংই যোগ সংসিদ্ধির ফলকে প্রদান করে। কালে এই অধ্যাত্মজ্ঞানের ফলে পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। এই অধ্যাত্ম জ্ঞান কাহার হয়? যাহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা আছে, তাহার হয়। আর কাহার, না যিনি ব্রহ্ম পরায়ণ এবং সংযতেন্দ্রিয়। এইরূপ ব্যক্তিই আত্মজ্ঞান দ্বারা পরম শান্তিকে লাভ করেন। এখন কর্ম্ম নাশ বিষয়ে শেষ কথা এই যে,—

> যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
> আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥

যাঁহার আত্মাতেই রতি, যিনি আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই যাঁহার সন্তোষ, সেই তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির কোন কর্ম্মই থাকে না। কর্ম্ম করিয়াও তিনি কর্ম্ম করেন না। কেন না তাঁহার চক্ষু এই যে দেখিতেছে, কর্ণ শ্রবণ করিতেছে, রসনা বাক্য বলিতেছে, নাসিকা ঘ্রাণ লইতেছে, ত্বক স্পর্শ করিতেছে, মন মনন করিতেছে, ইহারা স্ব স্ব বিষয়রস আকর্ষণ করিয়া অন্তরে ভোক্তা জীবাত্মাকে তাহাতে সিক্ত করিবার জন্য প্রদান করিতেছে। এ দিকে জীবাত্মা আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানাগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া অন্তরস্থ প্রীতি-কুসুমে পরমাত্মার পূজা করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছে, আর যেমন যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের আহৃত বিষয়বন্ধনোপযোগী সামগ্রী সকল তাহার নিকট উপস্থিত হইতেছে, অমনি সেই জ্ঞানাগ্নিতে তাহা পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া যাইতেছে। ইহাই রহস্য, ইহাই সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম-সাধনের পরম কৌশল।

> যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতা
> জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।

যে ব্যক্তির কর্ম্মসকল ফল কামনা-

বর্জ্জিত হয়, সেই ব্যক্তিই পণ্ডিতপদবাচ্য। কারণ জ্ঞানাগ্নিদ্বারা তাহার কর্ম্মসকল ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। যাঁহার অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, তিনিই কামনাবর্জ্জিত হইতে পারিয়াছেন—তিনিই কর্ম্মে আসক্ত নহেন, সুতরাং তাঁহাকে কর্ম্ম বন্ধন করিতে পারে না। যাহা কিছু বাহ্য, যাহা মানুষকে সংসারে বন্ধন করে, তাহাই অধ্রুব, আর যাহা মানুষকে বন্ধন হইতে মুক্ত করে তাহাই ধ্রুব। এখন ইহা আমরা বুঝিয়াই বলিতেছি—

জানাম্যহং সেবধিরিত্যনিত্যং।
নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবংতৎ॥

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

(চতুর্থ উপদেশের অনুবৃত্তি)

পাপ পুণ্যের বিচার ও দণ্ড পুরস্কারের বিচার—এই দুইটি একসূত্রে আবদ্ধ। বস্তুত, ভাল কাজ করিতেছি কি মন্দ কাজ করিতেছি এ কথা না জানিয়া যে ব্যক্তি কোন কাজ করে, তাহার সে কাজে পাপও নাই পুণ্যও নাই। যখন কোন জড় পদার্থের দ্বারা, অজ্ঞাতসারে কোন হিতজনক কিংবা অহিতজনক কার্য্য সম্পাদিত হয়, তখন যেমন তাহার সেই কার্য্যে পাপও নাই পুণ্যও নাই—ইহাও সেই প্রকার। অনিচ্ছাকৃত অপরাধের কোন দণ্ড নাই কেন? তাহার কারণ, ইচ্ছাকৃত নহে বলিয়াই তাহা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয় না। এই জন্যই অপরাধের মোকদ্দামায়, অপরাধীর পূর্ব্ব-সংকল্পকে এতটা প্রাধান্য দেওয়া হয়। একটা বিশেষ বয়স পর্য্যন্ত বালক-অপরাধীকে লঘু দণ্ড দেওয়া হয় কেন? তাহার কারণ, ভাল মন্দের জ্ঞান ও স্বাধীনতার জ্ঞান না থাকায়, তাহার কাজকে সুকৃতিও বলা যায় না দুষ্কৃতিও বলা যায় না; শুধু সুকৃতি ও দুষ্কৃতিই দণ্ড পুরস্কারের যোগ্য। যদি কোন ব্যক্তি অনিষ্টজনক কোন কাজ করে, অথচ যদি তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক না করে, তাহা হইলে ক্ষতির পরিমাণ-অনুসারে তাহাকে ক্ষতিপূরণের দণ্ড দেওয়া হয় মাত্র; যাহাকে প্রকৃত দণ্ড বলে, সেরূপ দণ্ডে সে দণ্ডিত হয় না।

অবস্থাবিশেষে কোন কাজ পাপ ও কোন কাজ পুণ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। কার্য্যের সেই বিশেষ অবস্থা ঘটিলে, তবেই সেই কাজে পাপ কিংবা পুণ্য প্রকাশ পায়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড পুরস্কারও আসিয়া পড়ে।

পুণ্য কাজ করিলে, পুরস্কৃত হইবার আমাদের স্বাভাবিক অধিকার আছে; এবং পাপ কার্য্য করিলে, আমাদিগকে দণ্ড দিবার অন্যের অধিকার আছে;—এমনও বলা যাইতে পারে,—আমাদের নিজেরও অধিকার আছে। কথাটা একটু অদ্ভুত শোনায়,—কিন্তু ইহা আসলে ঠিক্। অনেক সময় দেখা যায়, অপরাধীরা নিজেই অপরাধের জন্য উচিত দণ্ড প্রার্থনা করে। পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল কষ্ট—এ কথা যেমন সত্য, পাপের সহিত কষ্টের একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে—এ কথাটাও তেমনি সত্য।

পাপ পুণ্য, যেন বৈধ ঋণস্বরূপ দণ্ড পুরস্কারের দাবী করে। কিন্তু পুণ্যের সহিত পুরস্কারকে এবং পাপের সহিত দণ্ডকে একীভূত করিলে চলিবে না। তাহা হইলে, কার্য্য ও কারণকে, ক্রিয়া ও পরিণামকে এক করিয়া ফেলা হয়। এমন কি,

যখন দণ্ড পুরস্কারের অস্তিত্ব থাকে না, তখনও পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব থাকে।

দণ্ড পুরস্কার পাপ পুণ্যের ফল—কিন্তু স্বয়ং পাপ পুণ্য নহে। দণ্ড পুরস্কারকে রহিত করিলেও, পাপ পুণ্যকে রহিত করা যায় না। পক্ষান্তরে, যদি পাপ পুণ্যকে উঠাইয়া দেও, তাহা হইলে প্রকৃত দণ্ডও থাকে না, প্রকৃত পুরস্কারও থাকে না। ধন ঐশ্বর্য্য কিংবা অযোগ্য সম্মান—এ সমস্ত শুধু ভৌতিক সুবিধা মাত্র; পুরস্কার জিনিসটা আসলে নৈতিক; পুরস্কারের মূল্য—পুরস্কারের আকারের উপর নির্ভর করে না। প্রাচীন রোমকেরা যে ওক্-গাছের পাতার মুকুটে বীরপুরুষদিগকে ভূষিত করিত, তাহা ইন্দ্রপুরীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও তাহারা মূল্যবান বলিয়া মনে করিত; কেননা উহা সমস্ত রোমক জাতির প্রদত্ত পুরস্কার-স্বরূপ সম্মান-চিহ্ন। পুরস্কার কি?—না, প্রতিদান। সৎকার্য্যের যে পুরস্কার তাহা সৎকার্য্যের ঋণস্বরূপ; সৎকার্য্য না করিয়া যে পুরস্কার লাভ করা যায় তাহা হয় ভিক্ষা নয় চৌর্য্য। দণ্ড সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। অপরাধের সহিত কষ্টের একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। শুধু কষ্টটাই সত্য নহে, এই সম্বন্ধটাও সত্য।

দুইটি কথা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা অবশ্যক, কেন না সে দুইটি কথাই সত্য। প্রথম কথাঃ—যাহা মঙ্গল তাহা স্বতই মঙ্গল, এবং তাহার ফল যাহাই হউকনা, তাহা সংসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; দ্বিতীয় কথাঃ—মঙ্গলের পরিণাম মঙ্গলই হইয়া থাকে। মঙ্গল হইতে বিচ্ছিন্ন যে সুখ তাহার কোন নৈতিক ভাব নাই, কিন্তু মঙ্গলের ফলস্বরূপ যে সুখ তাহাই নৈতিক জগতের অন্তর্ভূত।

সুখহীন ধর্ম্ম, দুঃখহীন পাপ—একথা পরস্পর-বিরুদ্ধ—এবং ইহা একটা ঘোর বিশৃঙ্খলতা। যদি ধর্ম্ম বলিতে ত্যাগ বুঝায়—অর্থাৎ কষ্ট স্বীকার বুঝায়—তাহা হইলে সেই ত্যাগের কষ্ট সাহসপূর্ব্বক সহ্য করিলে, পরিণামে তাহার পুরস্কার স্বরূপ সেই সুখই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা গোড়ায় বিসর্জ্জন করা হইয়াছিল;—ইহাই শাশ্বত ন্যায়বিচার। এবং সুখের প্রলোভনে কোন পাপ কর্ম্ম করিলে পরিণামে দুঃখ পাইতে হইবে—ইহাও শাশ্বত ন্যায়বিচার।

এখন দেখা যাউক—ভাল ও মন্দ কার্য্যের সহিত যে সুখ দুঃখের নিয়ম সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহা কিরূপে সংসিদ্ধ হয়। এই পৃথিবীতেই অধিকাংশ স্থলে সেই নিয়মটি কার্য্যে পরিণত হয়। এই পৃথিবীতেই একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার আধিপত্য দেখা যায়। ইহলোকে কখন কখন এই নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হইলেও, পাপ পুণ্যের সহিত দণ্ড পুরস্কারের সম্বন্ধ না থাকিলেও, ইহা নিশ্চিত—অখণ্ড মঙ্গলের নিয়ম, পাপ পুণ্যের নিয়ম, কর্ত্তব্যের নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। একথা আমাদের জ্ঞান কখনই অস্বীকার করিতে পারে না। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস,—যিনি আমাদের অন্তরে নৈতিক শৃঙ্খলার জ্ঞান ও ভাব নিহিত করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং ইহাকে কখনই ব্যর্থ হইতে দিবেন না,—শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, ধর্ম্মের সহিত সুখের সমন্বয় তিনি অবশ্যই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন,—কি উপায়ে করিবেন সে তিনিই জানেন। সেই দূর-ভবিষ্যতের রহস্য উদ্‌ঘাটনের এখনও আমাদের সময় হয় নাই। এখন আমরা কেবল নৈতিক সত্যের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য সচেষ্ট হইব—এখন আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

—

উন্নতির মূলকারণ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে মনুষ্যের সর্ব্ববিধ উন্নতি চারিটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। আমরা যতই আলোচনা করিয়াছি, ততই তাঁহার এই সত্যবাক্যের উপর আস্থাবান হইতেছি। সে চারিটি বিষয় কি, না জন্ম, শিক্ষা, সঙ্গ ও সাধনা। এক দিকে যেমন মনুষ্যত্বের বিকাশ এই চারিটি বিষয় সাপেক্ষ, তেমনি অন্যদিকে আমাদের অবনতিও উহার উপর নির্ভর করে।

১ম, জন্ম। পিতা মাতা ও বংশের গুণ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রেতে সঞ্চারিত হয়। আমরাও দেখিয়াছি এবং বিজ্ঞানও সাক্ষ্য প্রদান করে যে পুত্র উত্তরাধিকারীসূত্রে পিতা মাতার গুণ প্রাপ্ত হয়। পিতা ধার্ম্মিক হইলে পুত্র প্রায়ই ধার্ম্মিক হয়। পিতা মাতা নিষ্ঠাবান ও দয়ালু হইলে সন্তান সন্ততিও তৎভাবাপন্ন হয়। অন্যপক্ষে পিতা নৃশংস ও দুষ্টস্বভাব হইলে সন্তান সন্ততি পিতার দোষ প্রাপ্ত হয়। এ নিয়মের যে ব্যভিচার নাই, সে কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। কেন না অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই সাধু পিতা মাতা হইতে অসৎ পুত্রেরও জন্ম হইয়া বংশকে কলঙ্কিত করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও সাধু পিতা মাতার অঙ্কে লালিত পালিত হইবার সৌভাগ্য যে সকল পুত্রের ঘটিয়াছে, তাহারা অনন্যসাধারণ অধিকারে অধিকারী। সাধু ও উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি পুত্র আপনার দায়িত্ব-বোধকে জাগাইয়া রাখিতে পারে, বংশের মুখ সমুজ্জল করিবার ইচ্ছা যদি তাহার অন্তরে জাগরূক থাকে, তবে সে সন্তান প্রকৃত উন্নতিলাভ করিবেই করিবে। কিন্তু যাহারা সাধু পিতা মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহাদের নিরাশার কোন কারণ নাই। তাহারা শিক্ষা সঙ্গ ও সাধনার প্রভাবে জন্মগত সৌভাগ্য ও সুবিধাকে অতিক্রম করিতে পারে।

২য়, শিক্ষা। শিক্ষা হইতে আমরা কি না প্রত্যাশা করিতে পারি। অরণ্যবাসী আদিম নিবাসী আর জ্ঞানোন্নত সুসভ্য লোক, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কে বিধান করে, না শিক্ষা। বিদ্যালয়ে জ্ঞান শিক্ষা, পিতা মাতার নিকট ভব্যতাশিক্ষা ও, গুরুর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা এই ত্রিবিধ শিক্ষা যদি কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে সত্যসত্য দেবভাব অবতীর্ণ হইবেই হইবে। কেবলমাত্র শিক্ষার গুণে মনুষ্যজাতির ভিতরে আকাশ পাতাল প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। সুশিক্ষা মনুষ্যের মুখ উজ্জল করে, জাতির মুখ উজ্জ্বল করে এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করে। আবার অন্য দিকে কুশিক্ষা প্রভাবে মনুষ্য দস্যু তস্কর ও নরহন্তার পদবী প্রাপ্ত হয়।

৩য়, সঙ্গ। হইতে পারে উচ্চ বা সাধু বংশে আমার জন্মগ্রহণ হয় নাই, ধার্ম্মিক পিতা মাতার রক্ত-বিন্দু আমাতে সঞ্চারিত হয় নাই, হইতে পারে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুবিধা আমার জীবনে ঘটে নাই, তাহা বলিয়া সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য হইতে কি আমি বঞ্চিত থাকিব, অন্তরের সাধুভাবগুলি কি প্রস্ফুটিত হইবে না। তাহা কখনই হইতে পারে না। আমি যদি সাধু-সঙ্গ লাভ করিতে পারি, তাঁহাদের আদর্শ-জীবন দেখিয়া যদি সুপথে চলিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমার জীবনে দেবভাব বিকশিত হইবেই। সাধুসঙ্গের প্রভাব মনুষ্য জীবনের উপরে বিশেষ-ভাবে কার্য্য করে। আমাদের দেশে তীর্থপর্য্যটনের যে বিধি

আছে উদ্দেশ্য সাধুসঙ্গলাভ তাহার অন্যতম লক্ষ্য। যে জ্ঞান বিদ্যালয়ে লাভ করিবার আমার সুযোগ ঘটে নাই, সে শিক্ষা সে জ্ঞান সাধুর সহবাসে সহজেই লাভ হইতে পারে। সাধুসঙ্গের গুণ বলিয়া শেষ করা যায় না। সাধুগণের জীবনের যে এক আকর্ষণী শক্তি আছে,তাহাতে সমাকৃষ্ট হইয়া কত লোকে যে প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। এই যে গৌরাঙ্গদেব, বুদ্ধদেব, নানক প্রভৃতি অনেকানেক ধর্ম্ম-প্রবক্তা তাঁহাদের চরিত্রের কি এক আশ্চর্য্য প্রভাব, কি বিস্ময়জনক আকর্ষণী শক্তি। তাঁহাদিগের কেন্দ্রাভিকর্ষিণী শক্তি প্রভাবে কত লোকের মোহ-মেঘ অপসারিত হইয়াছে, কতলোক চিরজাগরণ লাভ করিতেছে, কত লোক গতিমুক্তির পথ প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার অন্য দিকে কুসঙ্গ প্রভাবে কত যুবার যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে।

৪র্থ সাধনা। হয়ত আমার জন্ম উচ্চ ও ধার্ম্মিক বংশে হয় নাই, বিদ্যালয়ে বা গৃহে আমি শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হই নাই, সাধু-সঙ্গ আমার জীবনে ঘটিয়া উঠে নাই, তাই বলিয়া কি সর্ব্ববিধ উন্নতি হইতে আমি চিরবঞ্চিত। তাহা কখনই নহে। যদি আমার সাধনা থাকে, চেষ্টা থাকে, অধ্যবসায় থাকে, ধর্ম্মলাভ ও ঈশ্বর লাভের জন্য পিপাসা থাকে, তবে দুর্দ্দম্য সাধনা-প্রভাবে আমি কি না হইতে পারি। আমি বিশ্ববিজয় করিতে পারি, যদি আমার সাধনা থাকে—উৎসাহ থাকে। উচ্চ বংশে বা সাধু বংশে জন্মিয়া অপরে যে সুবিধা লাভ করিতে সক্ষম হয়, শিক্ষা দ্বারা যে উৎকর্ষ সাধিত হয়, সৎসঙ্গের দ্বারা চরিত্রের যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, এ সকলেরই তেজ খর্ব্ব করিয়া সাধনার প্রভাব উর্দ্ধে জ্বলিতে থাকে।

যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্ম প্রবক্তা কেবল তাঁহারা নিজ নিজ সাধনা অধ্যবসায় ও চেষ্টা প্রভাবে দৈব-বল দৈব-শিক্ষা লাভ করিয়া সমগ্র জন-সমাজকে পরিচালিত করেন এবং তাঁহাদের শিক্ষা ও তাঁহাদের বাণী লোকসমাজ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে। বুদ্ধদেবের শিক্ষা কোথায় ছিল, যিশুখৃষ্টের শিক্ষা কোথায় ছিল, অধুনতন সময়ে রামকৃষ্ণের শিক্ষা কোথায় ছিল,কিন্তু তাঁহারা যে শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন; তাহার গুরুত্ব অনুভব করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই যে ঐকিক অর্থাৎ ব্যক্তিগত সাধনা, সত্য সত্যই ইহার বল ইহার তেজ সমগ্র মানবসমাজকে চমকিত করে।

সেই জন্যই বলিতে চাই, যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবার আমাদের বাসনা থাকে, তাহার উপায় শিক্ষা সঙ্গ ও সাধনা; এবং এই মনুষ্যত্ব লাভের অনন্যসাধারণ সুবিধা ও সুযোগ জন্ম, অর্থাৎ উচ্চবংশে বা ধার্ম্মিক বংশে জন্ম পরিগ্রহণ।

শিক্ষা ও সংস্কার।

প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা দেশের মধ্যে বিস্তারিত না হইলে সংস্কারকার্য্য আদৌ চলিতে পারে না। যেমন ভূমিকে সর্ব্বাগ্রে কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিলে সে বীজ অঙ্কুরিত হইবেই হইবে, তেমনি জনসমাজের ভিতরে শিক্ষা বিস্তারের সর্ব্বপ্রথমে চেষ্টা করিয়া পরে সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিলে সংস্কারকের হতাশ হইবার কোন কারণ থাকে না। আমাদের দেশে

নানা কারণে সংস্কারের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কারের আবশ্যকতা দিন দিন অনুভূত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ অর্দ্ধ-শতাব্দীর বহু পূর্ব্ব হইতে সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, এবং অনেক দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার অভাবে অনেকে ব্রাহ্মসমাজের মহৎ উদ্দেশ্য ধারণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সংস্কারের আবশ্যকতা নিজে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া, তাহার গুরুত্ব না বুঝিয়া, যদি সেই সংস্কার আমি আমার জীবনে ও কার্য্যে গ্রহণ করি, তবে তাহা এক ভাবে বলিতে গেলে কুসংস্কারের নামান্তর মাত্র। সংস্কার শিক্ষার নিত্য-সঙ্গী। সুশিক্ষা-বিহীন সংস্কার কিছুতেই স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারে না। বরং সেইরূপ সংস্কার জনসমাজের ভিতরে অমঙ্গল আনয়ন করে। আমরা এদেশে শিক্ষা বিস্তারের যতই কেন গর্ব্ব করি না, ভারতবর্ষ এখনও প্রকৃত শিক্ষা হইতে বহু দূরে। আমরা সে দিন কোন মাসিক পত্রিকায় (Indian World) দেখিতেছিলাম যে এদেশে প্রতি দশজন পুরুষের ভিতরে কেবলমাত্র একজন, এবং প্রতি ১৪৬ জন স্ত্রীলোকের ভিতরে একজনমাত্র লিখিতে ও পড়িতে পারেন। ইহা শুনিয়া সত্য-সত্যই আমাদের মস্তক লজ্জায় অবনত হয়। যাঁহারা লিখিতে ও পড়িতে জানেন তাঁহাদের মধ্যে কয়জনই বা সংবাদপত্র ক্রয় করিতে বা পড়িতে সক্ষম। উক্ত প্রবন্ধের লেখক (Saint N. Sing) বলেন যে জাপানী কুলীরা প্রতিদিন কার্য্যের ভিতরে সামান্য অবকাশ পাইলেই প্রাত্যহিক সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকে। তিনি আরও বলেন আমি জাপানে একজন মাত্র নিরক্ষর জাপানী দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। এই যে দেশব্যাপী শিক্ষা ইহাই জাপানের উন্নতির মূল। বাধ্য করিয়া স্ত্রী পুরুষ সকলকে বিনা মূল্যে সুশিক্ষিত করিবার বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত না হইলে ভারতের সৌভাগ্য ফিরিবে না। জাপানে এইরূপ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সর্ব্বসাধারণ লাভ করিতে বাধ্য। যাঁহারা দেশের ভিতরে মনীষী, তাঁহারা যখন যাহা বলেন বা লিখেন, অন্যান্য সকলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করে। মনীষীই বল, নেতাই বল, আর দেশসংস্কারকই বল তাঁহাদিগকে অরণ্যে রোদন করিতে হয়, না। এই ব্রাহ্মসমাজের ভিতর হইতে অনেক সময়ে যে সকল গুরুগম্ভীর উপদেশ প্রদত্ত হয়, নিতান্ত পরিতাপের সহিত স্বীকার করিতে হইবে, ব্রাহ্মসমাজের নিতান্ত অন্তরঙ্গ লোকের মধ্যেও অনেকের তাহা ধারণা করিবার সামর্থ্য নাই। কারণ অন্য আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র শিক্ষার অল্পতা।

ভারতবর্ষে নেতার অভাব নাই। কি ধর্ম্মরাজ্যে কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদেশে এমন অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা অত্যুজ্জ্বল প্রতিভায় এবং পরিপুষ্ট জ্ঞানে পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশের সুবিজ্ঞ নেতাগণ অপেক্ষা কোন অংশে হীনবীর্য্য নহেন। কিন্তু সুশিক্ষিত শ্রোতা ও সহচরের অভাবে তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছে না। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় (University) কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য; কিন্তু জাপানের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-প্রদানের জন্য। সেখানে অনুত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। চারিটি বিষয়ের মধ্যে হয় ত তিনটি বিষয়ে আমি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলাম, একটি মাত্র বিষয়ে আমি অকৃতকার্য্য হইলাম।

পর বৎসরে আমাকে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ঐ চারিটি বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু জাপানের ব্যবস্থা অন্যরূপ। যে বিষয়টিতে আমি উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই, কেবলমাত্র সেই বিষয়টিতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে আমি সর্ব্ববিষয়ে উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য হইব। বাস্তবপক্ষে ঐরূপ ব্যবস্থা এদেশে প্রচলিত না থাকায় অনেকের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, অনেকের প্রতিভা এককালে বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। রাজকীয়-বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত রাজকীয়-সম্বন্ধবিহীন অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় জাপানে রহিয়াছে। শিল্পবয়ন ও বাণিজ্য-বিদ্যা কত স্থানে অধীত হইতেছে। হায়! আমাদের দেশে ঐরূপ শিক্ষালাভের সুন্দর বিধান না থাকায় কতশত যুবককে দেশ বিদেশে গমন করিতে হইতেছে।

প্রায় ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে জাপানের রাজাজ্ঞা এই ভাবে বিঘোষিত হইয়াছিল যে, "এই ভাবে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে যাহাতে জাপানের কোন গ্রামে একটিমাত্র নিরক্ষর পরিবার না থাকে এবং একটি পরিবারের ভিতরে একজনও নিরক্ষর না থাকে।"

কেবলমাত্র সাহিত্য গণিত শিক্ষা নহে জাপানে শিল্পশিক্ষা ব্যায়ামশিক্ষা বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। জাপানে অশিক্ষিতা স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায়ই সমান; নাই বলিলেই হয়। স্ত্রীশিক্ষা দিন দিন বিস্তারিত হইতেছে। এমন কি জাপানে স্ত্রীলোকের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় (Woman's University) আছে। ফলে জাপানে স্বদেশবাৎসল্য ভাবে ভঙ্গীতে রচনায় কাব্যে সাহিত্যে চারিদিক হইতে উথলিয়া উঠিতেছে।

অবশ্য ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক করিয়াছেন ও অনেক করিতেছেন, এবং সে দিন নিতান্ত দূরে নহে যখন ভারতের সমগ্র নরনারী ইংরাজ শাসনে অন্ততঃ সামান্যরূপ লিখিবার ও পড়িবার শক্তি লাভ করিবে। আমরা সতৃষ্ণ নয়নে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি যে দিনে সুশিক্ষিত জনসমাজ পাইয়া দেশহিতৈষীর ধর্ম্ম-প্রচারকের ও ধর্ম্ম-সংস্কারকের গুরুতর পরিশ্রম লঘু হইয়া আসিবে এবং সমগ্র জনসমাজকে তাঁহারা স্বল্পায়াসে কর্ত্তব্যের পথে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করিতে সক্ষম হইবেন।

প্রার্থনা।

আমি কি ভুলিয়া আছি! না তা কভু নয়,
তোমাতেই পরিপূর্ণ সারা এ হৃদয়।
হৃদয় শোনিতে মোর নিঃশ্বাস প্রবাহে
তোমার পরশ শান্তি দিবানিশি বহে।
জাগরণে অচেতনে কার্য্যে বা হেলায়,
তোমারে হৃদয় মাঝে রেখেছি জাগায়।
আমার দুর্ব্বল মন কত শত বার,
আলো না দেখিয়া শুধু দেখে অন্ধকার।
কিন্তু তুমি হে দেবতা জাগ্রত মহান,
তখনি করিছ শান্ত এ অশান্ত প্রাণ,
অতৃপ্তি অভাব নাশি, নাশি মোহ:ভয়
তোমারি করিয়া নেছ সারাটি হৃদয়।
তৃপ্তি, সুখ, লভি প্রাণ, কৃতজ্ঞতা ভরে
আপনি লুটিয়া পড়ে ও চরণ পরে।

প্রার্থনা।

আজি দয়া কোরে জাগালে আমারে
জাগিয়া উঠেছি তাই।
বিশ্বের আনন্দ পরশ হিল্লোল
হৃদয় মাঝারে পাই।
কনক কিরণ ঢালিছে তপন,
ফুটেছে কুসুম বিচিত্র বরণ,
সুমঙ্গল গীতি গাহে বিহঙ্গম
কাহার করুণা চাই।
তোমার করুণা জাগিছে অন্তরে,
তোমারে চাহিছে মন।
তুমি আছ দেব কোথা কোন দূরে
তবু এ কি আকর্ষণ!
অসীম অনন্ত সুনীল আকাশে,
সলিলে কুসুমে সুরভি বাতাসে,
স্নেহ প্রীতি প্রেমে, তুমি আছ জেগে,
তুমি ছাড়া কিছু নাই।

শ্রী সরোজকুমারী দেবী

অর্জ্জুনের স্তব।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ॥
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বতএব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥

গীতা, একাদশ অধ্যায়।

অনুবাদ।

(নব-রত্নমালা হইতে উদ্ধৃত)

তোমার অক্ষয়কীর্ত্তি জগতে প্রচার,
তব নামে পুলকিত অখিল সংসার,
রক্ষঃকুল শুনি ভয়ে দিগন্তে পলায়
সিদ্ধগণ ভক্তিভরে নমে তব পায়।
কেনই বা না নমিবে, তুমি যে মহান্,
ব্রহ্মার জনক তুমি সর্ব্ব গরীয়ান্।
সুরপতি, জীবগতি, জগত নিবাস,
সদসৎ-পরতর, পূর্ণ অবিনাশ।
তুমিই দেবাধিদেব, পুরুষ পুরাণ,
নিখিল বিশ্বের তুমি পরম নিধান।
সরবজ্ঞ, জানিবার বস্তুও হে তুমি,
অনন্ত-স্বরূপে ব্যাপ্ত স্বর্গ, মর্ত্ত্য ভূমি।
অনল, অনিল, যম, শশাঙ্ক, বরুণ,
প্রজাপতি পিতামহ, চাহ সকরুণ।
নমি আমি কর জোড়ে, নমি শতবার,
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রভু পদে করি নমস্কার।
সম্মুখে পশ্চাতে, হরি, করি নমস্কার,
সর্ব্বদিকে প্রণিপাত চরণে তোমার।
তুমি হে অনন্ত বীর্য্য, অমিত বিক্রম,
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, পুরুষ পরম।
হেন বিশ্বরূপ তব মহিমা অপার,
প্রমাদ, প্রণয় বশে না জানিয়া সার।
সখা জ্ঞানে বলিয়াছি আমি কত বার
"ওহে কৃষ্ণ! হে যাদব! সখা হে আমার!"
অবজ্ঞায় পরিহাস করিয়াছি কত,
সমক্ষে পরোক্ষে করি অপরাধ শত,
আহার, বিহার শয্যা, ভোজনে বা কভু,
নিজগুণে ক্ষম তাহা এমিনতি, প্রভু!
লোক-চরাচরে তুমি পিতার সমান,
তুমি হে জগত-বন্দ্য গুরু গরীয়ান,
কেহ না সমান তব অধিক কোথায়,
তোমার মহিমা ভাতি ত্রিভুবনে ভায়।
অতএব নমি, দেব, প্রণত শরীরে,
তোমার প্রসাদ, প্রভু মাগি অশ্রুনীরে।
পিতা পুত্রে ক্ষমে যথা, প্রণয়ী প্রীয়ায়,
সখায় যেমতি সখা, ক্ষম গো আমায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমগ্র ভারতের যে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, আমরা যতই আলোচনা করি, স্তম্ভিত হইয়া যাই। অবশ্য রাজা রামমোহন রায় সকলেরই পথ প্রদর্শক। রামমোহন রায়ের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চারিদিকে ঘোর নিবিড় অন্ধকার, বেদ-উপনিষৎ বঙ্গদেশ হইতে একপ্রকার বিতাড়িত, চারিদিকে প্রতিকুল অবস্থার সমাবেশ, তাহার ভিতর হইতে রামমোহন চতুষ্পাটীতে বসিয়া নহে কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন নিজের চেষ্টায় বেদ-উপনিষদের সন্ধান লইলেন, বেদান্ত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন, বিবিধ হিন্দু-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন, মুসলমান শাস্ত্র পাঠ করিলেন, অনেকানেক ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন এবং তাহাতেও নিরস্ত না থাকিয়া একেশ্বরবাদ ঘোষণা করিলেন, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার সরস হৃদয় হইতে ব্রহ্মসঙ্গীত যাহা উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণে বৈরাগ্যের বীজ শ্রোতার অন্তরে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। তিনি যে অঙ্কুর উদ্গত দেখিয়া এখানকার বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লাভ করিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মত সাধকের অভাবে তাহা অকালে শুষ্ক হইয়া যাইত। কি আশ্চর্য্য যুগান্তর রামমোহন প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন! বর্ত্তমান সময়ে বসিয়া তাঁহার সৎসাহসের কণামাত্র ধারণা করিবার আমাদের সামর্থ্য নাই। রাজা রামমোহন না জন্মিলে যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অভ্যুত্থান হইত না, একথা যেমন সত্য, ইহা তেমনি সত্য যে দেবেন্দ্রনাথের অভাবে রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত বিধান কিছুতেই বিকাশ প্রাপ্ত হইত না; যদি বা বিকাশ পাইত, পূর্ণ এক শতাব্দীর অধিককাল বিলম্ব ঘটিত।

রামমোহনরায়ের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর পুনঃ প্রকাশের জন্য আমরা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু ও স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর নিকট বিশেষ ঋণী। রামমোহন রায়ের কার্য্যের বিকাশ বহুল পরিমাণে তাঁহার রচিত গ্রন্থে, কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে। ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্যাবলী যেমন ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রে নিনাদিত, তাঁহাদের মহত্ব বিঘোষিত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনব্যাপী কর্ম্ম সেরূপ কোন সংবাদপত্রে বিঘোষিত নহে। তিনি আত্ম-প্রশংসা কোন কালেই ভাল বাসিতেন না; উহা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ সময় হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত সেরূপ সংবাদপত্রের বিদ্যমানতা ছিল না। মহর্ষি তাঁহার মৃত্যুর কতকাল পূর্ব্বে নিজজীবনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পাছে আত্মঘোষণা হয়, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি অনেক দিন ধরিয়া উহা বাহিরে প্রকাশিত হইতে দেন নাই। সাধারণের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি তাহা সাধারণের ভিতরে বহির করিবার আদেশ দেন। শ্রদ্ধেয় কেশব বাবুর প্রতিভার বিকাশ মহর্ষি হইতে। কেশব বাবু মহর্ষির সহিত মিলিত না হইলে বুঝি বা তাঁহার বিকাশ ধর্ম্মের দিকে জগতের সমক্ষে এত শীঘ্র হইত না। আত্মসম্মানের দিকে মহর্ষির এতই দৃষ্টি ছিল, পরকে তিনি এতই সম্মান দিতেন, যে পাছে ইঙ্গিতে কেশব বাবু বা তাঁহার দলস্থ কাহারও বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে হয়, তাই তিনি আপনার "আত্মজীবনীর" কাহিনী অসময়ে অকালে পরিসমাপ্ত করিলেন। কেশব বাবুর সহিত মিলনের কথা আনন্দের সহিত লিপিবদ্ধ করিলেন, তাঁহার সহিত মতভেদ জনিত পার্থক্যের কথা একেবারেই বলিলেন না। সত্য সত্য সেই মধ্য-বয়সে কিছু মহর্ষির জীবনব্যাপী কার্য্যের অবসান হয় নাই; তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছেন, অথচ সে সকল বিষয়ের কথা বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করিয়া তুষ্ণিম্ভাব ধারণ করিলেন। তিনি সকল সম্মান সকল প্রশংসা ঈশ্বরকে প্রদান করিতেন, আত্মপ্রচারদোষে কখনই তিনি কলঙ্কিত নহেন। যেরূপ উৎসাহের সহিত মহর্ষি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, যে স্থিরতা ধীরতা আত্মসংযম ও অনন্যসাধারণ বৈরাগ্যের সহিত সাধনা করিয়াছেন, যাঁহারা তাহা লক্ষ্য করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জীবিত নহেন। আজকালকার লোক তাঁহার কর্ম্মঠ জীবনের অশেষ কার্য্যের সুনিপুণতা দর্শন করিবার সুযোগ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই; যাহা কিছু দেখিয়াছেন তাহাতেই তাঁহারা বিমুগ্ধ। তাঁহারা সাধনারত আত্মরতি স্থবির মহর্ষিকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা যুবক বা প্রৌঢ় মহর্ষির কার্য্যাবলী সন্দর্শন করেন নাই, কিন্তু যাহা কিছু দেখিবার অবকাশ পাইয়াছেন, তাহাতেই স্তম্ভিত।

মহর্ষি নিজ হস্তে যে আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের অমূল্য সম্পত্তি। যাঁহারা অধ্যাত্ম জগতে বিচরণ করিয়া পরলোকের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে চান, মহর্ষির জীবন ও তাঁহার রচিত "আত্মজীবনী" তাঁহাদিগকে সে সন্ধান দিবে। আপনার দীক্ষা দিন স্মরণ করিয়া তাহাকে মহিমান্বিত করিতে, বোলপুরে শান্তিনিকেতনের মত মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া নীরবে ধর্ম্মের দিকে সকলকে নিঃশব্দে আহ্বান করিতে কয়েকজন লোকের প্রবৃত্তি জন্মে?

মহর্ষির এক একটি কার্য্য যদি আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, আমরা তাহাতে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইয়া যাইব।

মহর্ষির কার্য্য-জীবনের সমসাময়িক লোক প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। দুই এক জন যাঁহারা জীবিত থাকেন, তাঁহারাও জরাজীর্ণ। মহর্ষির ব্যাকুল জীবনের প্রকৃত চিত্র দেখিবার উপায় অতি অল্পই রহিয়াছে। সেদিন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহর্ষির কয়েকখানি চিঠি "পত্রাবলী" নাম দিয়া বাহির করিয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। পত্র কয়েকখানিমাত্র হইলেও উহাতে মহর্ষিহৃদয়ের উদারতা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

মহর্ষির আত্মজীবনী কেবলমাত্র বঙ্গভাষায় থাকায় ভারতের অন্যান্য স্থানের অধিবাসী উহার ইংরাজি অনুবাদ দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এস, উহার অপূর্ব্ব অনুবাদ বাহির করিয়াছেন। তাহা আমরা গত বারে উল্লেখ করিয়াছি। সত্যেন্দ্র বাবু মহর্ষিজীবনের অনেকগুলি কথা গ্রন্থ-মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহার সারাংশ নিম্নে দিলাম। বলা বাহুল্য শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্র বাবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বলিতেছেন "আমার পিতা ১৮১৭ সালে জন্ম পরিগ্রহ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রথম শিক্ষা ; পরে তিনি হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র। প্রভূত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে যৌবনের পূর্ব্ব হইতে ঈশ্বরের জন্য পিপাসা তাঁহাতে আসিয়া পড়িল। তিনি ১৮৩৯ সালে তত্ত্ববোধিনী-সভা স্থাপন করিলেন ; তাহার পরে তাঁহারই উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার প্রকাশ; তাহার পরে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ। তিনি আরও কয়েক জনের সঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৪৪ সালে মহর্ষি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করেন। পর বৎসর বেদাধ্যয়নের জন্য তিনি চারি জন যুবককে কাশীতে প্রেরণ করেন। সুবিখ্যাত পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৪৫ সালে খ্রীষ্টীয় পাদরীগণের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সংগ্রাম উপস্থিত হয়। পরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সঙ্কলিত করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ তিনিই নিরূপণ করেন। তিনি মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, ঢাকা, রংপুর, কৃষ্ণনগর, প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করান। আদি-ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া এই সকল শাখা-ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে তাঁহার জীবনের প্রায় বার বৎসর কাটিয়া যায়। ১৮৪৬ অব্দে তাঁহার পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়। তিনিই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার শ্রাদ্ধে অ:পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুতে পিতার ঋণ-জালের পরিমাণ প্রায় এক কোটী টাকা এবং প্রাপ্য টাকার পরিমাণ ৪৩ লক্ষ টাকা। তিনি অমানুষিক ধৈর্য্যের সহিত অতি সামান্যমাত্র টাকা নিজ পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তির দ্বারা অনন্যসাধারণ সহিষ্ণুতা ও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা পিতার প্রভূত ঋণ পরিশোধ করেন। ইহাতেই তাঁহার নাম সততার জন্য সুবিখ্যাত হইয়া উঠে।

মহর্ষির পিতা, মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেককে অনেক টাকা দিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়া যান, তাহা অপরিশোধিত অবস্থায় ছিল। মহর্ষি পিতার নির্দ্দেশ অনুসারে কেবল মাত্র কলিকাতা দাতব্য-সভাতেই সুদ ছাড়া এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর হইতে মহর্ষি দেশবিদেশ প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থান লাহোর, মূলতান, অমৃতসর, রেঙ্গুনে গমন করিয়া, যেখানে সম্ভব, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৬ সালে সর্ব্বপ্রথমে হিমালয়ে গমন করেন। দেড় বৎসর ধরিয়া শিমলার নিকটস্থ স্থানে যাপন করেন। সেখানে কেবলই পাঠ ও ধ্যান-ধারণায় তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। সিপাহি-মিউটিনির অত্যল্প পরেই তিনি সমুন্নত আত্মা লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে মন প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। "ব্যাখ্যান" এই সময়েই তাঁহার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়কন্দর হইতে বিনির্গত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিমোহিত করিতে থাকে। আমি (সত্যেন্দ্র বাবু) তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতাম। আমার পিতার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় বলিতে গেলে ১৮৫৯ হইতে। এই সময়ে কেশব বাবু আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হয়েন। আমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পিতার সমীপে লইয়া যাই। ১৮৬২ সালে কেশব বাবুর পত্নী আমাদের বাটীতে আসিয়া কিছুদিনের জন্য অবস্থান করেন। কেশব বাবুর সহিত মিলিত হইয়া মহর্ষি ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন। কেশব বাবু ইংরাজিতে এবং পিতা বঙ্গভাষায় বক্তৃতা দিতেন। ১৮৬২ সালে কেশব বাবু আচার্য্য পদে বরিত হয়েন এবং আমার পিতা প্রধান আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হয়েন। কিন্তু কেশব বাবুর সহিত এই যে মিলন, তাহা স্থায়ী হয় নাই। আমার পিতা উপনিষদের দারুণ পক্ষপাতী, সামাজিক সংস্কার ও জাতিভেদ উচ্ছিন্ন করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ভারতবর্ষই সকল প্রকার পবিত্রতার আকর বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। ভারতবর্ষের ধর্ম্মগ্রন্থই তিনি পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করিতেন। মধ্যবর্ত্তীতাবাদ ও গুরু-বাদ তিনি আদৌ স্বীকার করিতেন না। আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ তাহা স্বাভাবিক, ইহাই তিনি শিক্ষা দিতেন। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে তিনি ধীরতার সহিত অগ্রসর হইবার পক্ষপাতী ছিলেন। যিশুখৃষ্টের মধ্যবর্ত্তিতার ও ঈশ্বরত্বের তিনি বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কেশব বাবুর মতামত অন্যরূপ ছিল। তিনি আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। সামাজিক সংস্কার অর্থাৎ শঙ্কর বিবাহ বিধবা বিবাহ, উপবীত ত্যাগ যখন অতিমাত্রার দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল, আমার পিতা তাহাতে সঙ্কুচিত হইলেন। আমার পিতার আদর্শ জাতীয়ভাব, কিন্তু কেশবের আদর্শ বিশ্বজনীন ভাব। কেশব বাবু ধর্ম্ম বিষয়ে আলোক অধিকমাত্রায় বাইবেল হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি তিনি এবং তাঁহার দলস্থ অনেকে পরে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন, মিশনরিরা এইরূপ আশা পোষণ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য ভাবে কেশব বাবু পরিপুষ্ট। এই সকল কারণে আমার পিতার সহিত কেশব বাবুর বিচ্ছেদ

ঘটিল। ১৮৬৫র ফেব্রুয়ারি মাসে উভয়ে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। কেশব বাবু তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের নাম ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজ দিলেন এবং এ সমাজের নাম আদি-ব্রাহ্মসমাজ হইল। আমার পিতার কার্য্যপ্রণালী সংশোধনের দিকে—আমূল পরিবর্ত্তনের দিকে ছিল না। ১০৮৯ সালে ভারতবর্ষীয়-ব্রহ্মমন্দির বিনির্ম্মিত হইল। কেশব বাবুর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলেও আমার পিতার প্রতি কেশব বাবুর ভক্তি ও শ্রদ্ধা কোন কালেই অবসন্ন হয় নাই।

কেশববাবুর সহিত বিচ্ছেদের পর হইতে আমার পিতার দৈহিক শক্তি বয়োধর্ম্মে হ্রাস হইতে লাগিল। অন্যান্য সুশিক্ষিত আচার্য্যেরা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার পিতা সকল বিষয়ে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ঈশ্বরের আদেশে নির্জ্জন সাধনে তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট সময় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তিনি কয়েক বৎসর হিমালয়ে ও চুচঁড়ায় ক্ষেপণ করিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ সময় কলিকাতায় অতিবাহিত হয়। তিনি ঋষি-জীবন অতিবাহিত করিলেন। ১৯০২ সাল হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভঙ্গ হইল। আমার ভগিনী সুকুমারী দেবীর বিবাহ অপৌত্তলিকভাবে সর্ব্ব প্রথমে ১৮৬১ সালে তিনিই সুসম্পন্ন করেন। তিনি অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান পদ্ধতি নিজে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি সকল ব্রাহ্মসমাজ হইতে অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইয়া সকলের নিকট হইতে শ্রদ্ধা লাভ করিয়া ১৯০৫। ১৯এ জানুয়ারী তারিখে বেলা ১টা ৫৫ মিনিটের সময় স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন"।

সংগ্রহ।

বিষ্ণুসংহিতা।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য বর্ণের মহাপাতকীর মৃত্যুদণ্ড করিবে। ব্রাহ্মণকে শারীরিক দণ্ড না দিয়া দেহে চিহ্ন দিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। যাহারা কূট শাসন করে, যাহারা জাল করে, যাহারা বিষপান করায়, গৃহে অগ্নি দেয়, দস্যুবৃত্তি করে, নরহত্যা করে, অধিক পরিমাণ ধান্য অপহরন করে, সুবর্ণরজত অধিকমাত্রায় চুরি করে, যাহারা নীচ হইয়াও রাজ্য কামনা করে, যাহারা সেতু ভগ্ন করে, যাহারা দস্যুগণকে স্থান ও আহার প্রদান করে, যে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য বা ব্যভিচারিণী, রাজা তাহাদিগকে বধ করিবেন। * * গর্হিত মাংসবিক্রেতা, হস্তী অশ্ব ও উষ্ট্র-হন্তার একটি হস্ত ও একটি পদ ছেদন করিবে। গ্রাম্য পশুঘাতীর অর্থদণ্ড করিবে এবং পশুঘাতী পশুস্বামীর হত-পশুর মূল্য দিবে। পক্ষীঘাতী ও মৎস্য-ঘাতারও অর্থদণ্ড করিবে। ফলোন্মুখ ও পুষ্পোন্মুখ বৃক্ষ ছেদন করিলে এবং মালতী মাধবী প্রভৃতি গুল্মলতা ছেদনে দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। প্রহারার্থ হস্ত বা পদ উদ্যত করিলে এবং বিনা রক্তপাতে দুঃখ উৎপাদন করিলে তাহারও দণ্ড আছে। উভয়নেত্রভেদী ব্যক্তিকে রাজা যাবজ্জীবন বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিবেন না। যে সকল ব্যক্তি প্রহারকাতর ব্যক্তির আহ্বানে সেই দিকে গমন না করে, অথবা যাহারা সে স্থান হইতে সরিয়া পড়ে তাহাদের প্রত্যেকের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। গো অশ্ব, উষ্ট্র ও হস্তী অপহরণ করিলে রাজা চোরের এক হস্ত ও এক পদ ছেদন করিবেন। সূত্র কার্পাস গোময়, গুড়, দধি, তক্র, তৃণ, লবণ, মৃত্তিকা, পক্ষী, মৎস্য, ঘৃত, তৈল, মাংস, মধু, বংশপাত্র বা লৌহ ভাণ্ড অপহরণ করিলে ঐ সকল দ্রব্যের মূল্যের তিন গুণ অর্থদণ্ড। যাহাতে চোরেরা অপহৃত বস্তু সকল অধিকারীকে ফিরাইয়া দেয়, রাজা তাহার ব্যবস্থা করিয়া পশ্চাৎ অপরাধীকে দণ্ড দিবেন। যাহাদিগকে মান্য দেওয়া উচিত, তাহাদিগকে মান্য না দিলে তাহার দণ্ড আছে। যাহাকে আসন দেওয়া উচিত, তাহাকে আসন না দিলে, প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া অন্য ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ ও ভোজন করাইলে তাহারও দণ্ড আছে। যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াও ভোজনে যায় না, সে নিমন্ত্রণকর্ত্তাকে দ্বিগুণ অন্ন ও তদ্ব্যতীত রাজদ্বারে অর্থদণ্ড দিবে। যে কম ওজন দেয় বা তদ্রূপ তুলাদণ্ড ব্যবহার করে, যে দেশান্তরগত পণ্য অধিক মূল্যে বিক্রয় করে, ক্রেতা ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যে বিক্রেয় দ্রব্য তাহাকে প্রদান না করে তাহাকে দণ্ড দিবে। ক্রেতা ক্রীতদ্রব্য গ্রহণ না করিলে যদি তাহা বিনষ্ট হয়, তবে সে ক্ষতি ক্রেতারই হইবে। রাজনিষিদ্ধ দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাহার দণ্ড আছে। নৌ-শুল্ক গ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তি স্থলজ শুল্ক গ্রহণ করিতে পারিবে না। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, যতি, গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও তীর্থযাত্রীর নিকট নৌ-শুল্ক গ্রহণ করিলে তাহার দণ্ড হইবে। ঠিকা চাকর নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে চাকরী পরিত্যাগ করিলে সে দণ্ডিত হইবে। নির্দ্ধারিত সময় পূর্ণ না করিয়া প্রভু বিনা দোষে ভৃত্যকে ত্যাগ করিলে, স্বামী ভৃত্যকে সমস্ত বেতন দিবেন এবং রাজাও ঐরূপ স্বামীকে দণ্ড দিবেন। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে পরদ্রব্য (চোরাই হউক বা যাহাই হউক) ক্রয় করিবে তাহাতে ক্রেতার দোষ নাই। তবে চুরি ধরা পড়িলে দ্রব্যস্বামী তাহা পাইবেন, ক্রেতার কিছুই হইবে না। যদি অপ্রকাশ্যভাবে হীনমূল্যে তৃতীয় ব্যক্তি তাহা ক্রয় করে, তবে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই চৌরবৎদণ্ড। গচ্ছিত দ্রব্য অপহরণ করিলে তাহার চৌরবৎ দণ্ড। যে ব্যক্তি সীমা-চিহ্ন বিলুপ্ত করে, সে দণ্ডিত হইবে। রাজা মিথ্যা সাক্ষীর সর্ব্বস্ব হরণ করিবেন। উৎকোচজীবীরও ঐরূপ করিবেন। আয়ুর্ব্বেদ অনভিজ্ঞ যদি মিথ্যা চিকিৎসা করেন, তাহারও দণ্ড আছে। যদি কেহ মূল্য দিয়া কোন বস্তু ভোগ করে তবে কে তাহারই। যে দ্রব্য পিতা যথাবিধ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে পুত্রকে কিছু বলিতে পারিবে না। যে ভূমি যথাবিধি তিনপুরুষ ভোগদখল করিয়া আসিতেছে, লেখা অর্থাৎ দলিল না থাকিলেও চতুর্থ-পুরুষ সেই ভূমি প্রাপ্ত হইবে। নখী, দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী, আততায়ী, হস্তী, হিংসা করিতে উদ্যত দেখিলে তাহাদিগকে বধ করিলে দোষ নাই ; গুরু বালক, বৃদ্ধ, শাস্ত্রবেত্তা

ব্রাহ্মণ আততায়ী হইয়া আসিলে তাহাকে বিচার না করিয়াই হত্যা করিবে, কেন না আততায়ীর দুষ্কার্য্যই হত্যাকারীর ক্রোধোদ্দীপক। (১) খড়্গাঘাত, (২) বিষ-প্রয়োগ, (৩) গৃহে অগ্নিদান, (৪) শাপদান, (৫) অভিচার, (৬) রাজসমক্ষে মিথ্যা কুৎসা, (৭) ভার্য্যাপহরণ করিতে যাহারা উদ্যত, এই সপ্তবিধ লোকই আততায়ী। অন্য অপরাধ, শাস্ত্রে যাহার বিধান নাই, রাজা ব্রাহ্মণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাহার দণ্ড প্রদান করিবেন। যে রাজ-কর্ম্মচারী দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করে, এবং যে অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড দেয়, তাহাকে দণ্ডনীয় বা দণ্ডিত ব্যক্তির দ্বিগুণ শাস্তি হইবে। যাহার নগরে চোর নাই, পরস্ত্রীগামী পুরুষ নাই, দুর্ব্বাক্যকারী লোক নাই, স্তেয়াদি কার্য্যে সাহসিক দুষ্টলোক নাই, সে রাজা ইন্দ্রলোকে গমন করেন।

উপরে কয়েকটি মাত্র অপরাধের দণ্ড লিখিত হইল। অবশ্য ব্রাহ্মণের শাস্তি সম্বন্ধে তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহা নিতান্তই স্বাভাবিক। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্রাহ্মণ জাতি স্বতই নিষ্ঠাবান, তাহাদের ভিতরে প্রাচীন সময়ে দুর্নীতির ভাব ও অপরাধ সংখ্যা নিতান্ত বিরল ছিল। তাহা সত্বেও কোন্ কোন্ অবস্থায় ব্রাহ্মণ বধ্য ও দেশ হইতে নির্ব্বাসনযোগ্য, উপরে তাহার পরিচয় দিলাম। এতদ্ভিন্ন অপরাপর অপরাধের দণ্ডের মাত্রা কিরূপ, তাহা যাঁহারা জানিতে চান, বিষ্ণু- সংহিতায় পরিচয় পাইবেন। ইংরাজের প্রথম আমলে যখন কোন ইংরাজ দেশীয়দিগের উপরে ঘোর অপরাধে লিপ্ত হইত, তাহার বিশেষ দণ্ড হইত না। ইংরাজ-বণিক-সম্প্রদায় তাহাকে নিজ হইতে খরচ দিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দিতেন।

প্রচীন হিন্দুরাজ্যে দেওয়ানি, ফৌজদারি, তামাদি, চুক্তি আইন বত্ব স্বত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরূপ আইন প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান প্রস্তাব হইতে পাঠকগণ তাহার কতকটা আভাস পাইবেন।

নানা কথা।

নিরামিষ ভোজন।—মুক্তি-ফৌজের সোসেল গেজেট নামক পত্রিকায় প্রকাশ যে যাহারা অতিরিক্ত মদ্যপায়ী, তাহাদের মধ্যে নিরামিষ-ভোজন প্রবর্ত্তন করায় আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষায়, জানা গিয়াছে যাহারা মাংসভোজী তাহাদের প্রবৃত্তি মদ্যপানের দিকে। ফল ও নিরামিষ আহার প্রদান করিলে মদ্যপায়ীর মদিরার প্রতি বিতৃষ্ণা আপনা হইতে অতি সত্বরই আইসে। বিজ্ঞানমূলক ধর্ম্ম পত্রিকা, অক্টোবর সংখ্যা।

অভিমত।—ডাক্তার H. C. Menkel সাহেব যিনি মসৌরী সেনিটেরিয়মের অধ্যক্ষ হইতেছেন, তিনি বলেন যে মাংসাহার ও মদিরাপানের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ রহিয়াছে, আমি স্বাস্থ্যনিবাসে থাকিয়া তাহার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। যেরূপ আহারে রক্তে ও পাকস্থলীতে উত্তেজনা আসিতে পারে, এইরূপ খাদ্যে মদিরার জন্ত পিপাসা সমধিক বর্দ্ধিত হয়। মাংসাহারেই এইরূপ উত্তেজনা বড়ই বৃদ্ধি পায়। তাঁহার এই অভিজ্ঞতার ফল উপরোক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

মদিরা-বিরতি।—ইংলণ্ডের বারমিংহাম নগরে Good Templars lodge নামক মদিরা নিবারণী সভা, জোসেফ মেলিন্স কর্ত্তৃক ১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। নানা স্থানে ইহার প্রায় চারি সহস্র শাখা আছে। সভ্য সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। প্রতি সপ্তাহে ঐ সকল সভায় অধিবেশন হয়। ইহাদের কার্য্যকলাপ কেবলমাত্র বক্তৃতাতেই অবসান হয় না। সভ্যগণ প্রতি গৃহস্থের বাটীতে গিয়া মদিরা হইতে বিরতির জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায় ফলে যে সকল নরনারী সর্ব্ববিধ মাদক সেবন হইতে বিরক্ত হইবার প্রতিজ্ঞা লইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যুবকের সংখ্যা প্রায় ষোল লক্ষ ও অপরিণত বয়স্কের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। নৌসেনা ও অপরাপর সেনাদলের মধ্যে এইরূপ অনেকগুলি lodge সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং দিন দিন সুফল প্রদান করিতেছে।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"
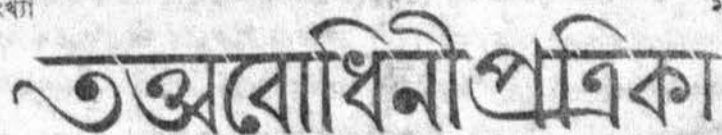
শান্তিনিকেতনের ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

প্রভাতের সূর্য্য যে উৎসব দিনটির পাপ্‌ড়িগুলিকে দিকে দিকে উদ্ঘাটিত করে দিলেন তারই মর্ম্মকোষের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্যে আজ আমাদের আহ্বান আছে। তার স্বর্ণরেণুর অন্তরালে যে মধু সঞ্চিত আছে সেখান থেকে কি কোনো সুগন্ধ আজ আমাদের হৃদয়ের মাঝখানে এসে পৌঁছয় নি? এই বিশ্ব উপবনের রহস্য-নিলয়ের ভিতরটিতে প্রবেশের সহজ অধিকার আছে যার, সেই চিত্তমধুকর কি আজও এখনো জাগ্‌ল না? কোনো বাতাসে এখনো সে কি খবর পায় নি? আজকের দিন যে একটি অনেক দিনের খবর নিয়ে বেরিয়েছে এবং সে যে সম্মুখের অনেক দিনের দিকেই চলেছে। সে যে দূর ভবিষ্যতের পথিক। আজ তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, তার যা কিছু কথা আছে সমস্ত আদায় করে নেওয়া চাই। সমস্ত মন দিয়ে না জিজ্ঞাসা কর্‌লে সে কাউকে কিছুই বলে না, তখন আমরা মনে করি, এই গান, এই বাদ্যধ্বনি, এই জনতার কোলাহল, এই বুঝি তার যা ছিল সমস্ত, আর বুঝি তার কোনো বাণী নেই! কিন্তু এমন করে তাকে যেতে দেওয়া হবে না—আজ এই সমস্ত কোলাহলের মধ্যে যে নিস্তব্ধ হয়ে আছে সেই পথিকটিকে জিজ্ঞাসা কর, আজ এ কিসের উৎসব?

প্রতি বৎসর বসন্তে আমের বনে ফলভরা শাখার মধ্যে দক্ষিণের বাতাস বইতে থাকে—সেই সময়ে আমের বনে তার বার্ষিক উৎসবের ঘটা। কিন্তু এই উৎসবের উৎসবত্ব কি নিয়ে, কিসের জন্যে? না যে বীজ থেকে আমের গাছ জন্মেছে সেই বীজ অমর হয়ে গেছে এই শুভ খবরটি দেবার জন্যে। বৎসরে বৎসরে ফল ধরচে—সে ফলের মধ্যে সেই একই বীজ—সেই পুরাতন বীজ। সে আর কিছুতেই ফুরচ্চে না—সে নিত্যকালের পথে নিজেকে দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত সহস্রগুণিত করে চলেছে।

শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের সফলতার মর্ম্মস্থান যদি উদ্ঘাটন করে দেখি

তবে দেখ্‌তে পাব এর মধ্যে সেই বীজ অমর হয়ে আছে যে বীজ থেকে এই আশ্রম বনস্পতি জন্মলাভ করেছে।

সে হচ্চে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ। মহর্ষির সেই জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম-বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্যে ফল্‌চে; এবং আমাদের আগামীকালের উত্তরবংশীয়দের জন্যে ফল্‌তেই চল্‌বে।

বহুকাল পূর্ব্বে কোন্ একদিনে মহর্ষি দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর ক'জন লোকেই বা জান্‌ত? যারা জেনেছিল যারা দেখেছিল তারা মনে মনে ঠিক করেছিল এই একটি ঘটনা আজকে ঘট্‌ল এবং আজ্‌কেই এটা শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটিকে সেই সুদূর কালের ৭ই পৌষ নিজের কয়েক ঘন্টার মধ্যে নিঃশেষ করে ফেল্‌তে পারেনি সেই একটি দিনের মধ্যেই এ'কে ঝুলিয়ে উঠ্‌ল না। সেদিন যার খবর কেউ পায়নি এবং তারপরে বহুকাল পর্য্যন্ত যার পরিচয় পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল সেই ৭ই পৌষের দীক্ষার দিন আজ অমর হয়ে বৎসরে বৎসরে উৎসব ফল প্রসব কর্‌চে।

আমাদের জীবনে কত শত ঘটনা ঘটে যাচ্চে কিন্তু চিরপ্রাণ ত তাদের স্পর্শ করে না—তারা ঘট্‌চে এবং মিলিয়ে যাচ্চে তার হিসেব কোথাও থাক্‌চে না।

কিন্তু মহাপ্রাণ এসে কার জীবনের কোন্ মুহূর্ত্তটিকে কখন্ লুকিয়ে স্পর্শ করে দেন, তার উপরে নিজের অদৃশ্য চিহ্নটি লিখে দিয়ে চলে যান—তারপরে তাকে কেউ না-দেখুক না জানুক, সে হেলায় ফেলায় পড়ে থাক্, তাকে আবর্জ্জনা বলে লোকে ঝেঁটিয়ে ফেলুক—সেদিনকার এবং তারপরে বহুদিনকার ইতিহাসের পাতে তার কোনো উল্লেখ না থাকুক—কিন্তু সে রয়ে গেল। জগতের রাশি রাশি মৃত্যু ও বিস্মৃতির মাঝখান থেকে সে আপনার অঙ্কুরটি নিয়ে অতি অনায়াসে মাথা তুলে উঠে—নিত্যকালের সূর্য্যালোক এবং নিত্যকালের সমীরণ তাকে পালন করবার ভার গ্রহণ করে—সদাচঞ্চল সংসারের ভয়ঙ্কর ঠেলাঠেলিতেও তাকে আর সরিয়ে ফেল্‌তে পারে না।

মহর্ষির জীবনের একটি ৭ই পৌষকে সেই প্রাণস্বরূপ অমৃতপুরুষ একদিন নিঃশব্দে স্পর্শ করে গিয়েছেন—তার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না। সেই দিনটি তাঁর জীবনের সমস্ত দিনকে ব্যাপ্ত করে কি রকম করে প্রকাশ পেয়েছে তা কারও অগোচর নেই। তারপরে তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যেও সেই দিনটির শেষ হয়নি। আজও সে বেঁচে আছে—শুধু বেঁচে নেই, তার প্রাণশক্তির বিকাশ ক্রমশই প্রবলতর হয়ে উঠ্‌চে।

পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশ লোকই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছি আমাদের মধ্যে সেই প্রকাশ নেই যে প্রকাশকে ঋষি আহ্বান করে বলেছেন, আবিরাবীর্ম্ম এধি—হে প্রকাশ তুমি আমাতে প্রকাশিত হও! তাঁর সেই প্রকাশ যাঁর জীবনে আবির্ভূত তিনি ত আর নিজের ঘরের প্রাচীরের দ্বারা নিজেকে আড়াল করে রাখ্‌তে পারেন না এবং তিনি নিজের আয়ুটুকুর মধ্যেই নিজে সমাপ্ত হয়ে থাকেন না। নিজের মধ্যে থেকে তাঁকে সর্ব্বদেশে এবং নিত্যকালে বাহির হতেই হবে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন

> যদৈতম্ অনুপশ্যতি আত্মানং দেবম্ অঞ্জসা
> ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যখন এই দেবতাকে এই পরমাত্মাকে,

এই ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বরকে কোনো ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেখ্‌তে পান তখন তিনি আর গোপনে থাক্‌তে পারেন না।

তাঁকে যিনি সাক্ষাৎ দেখেছেন অর্থাৎ একেবারে নিজের অন্তরাত্মার মাঝখানেই দেখেছেন তাঁর পর্দ্দা নেই, দেয়াল নেই, প্রাচীর নেই—তিনি সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের। তাঁর কথার মধ্যে আচরণের মধ্যে, নিত্যতার লক্ষণ আপনিই প্রকাশ পেতে থাকে।

এর কারণ কি? এর কারণ হচ্চে এই যে, তিনি যে আত্মানং, সকল আত্মার আত্মাকে দেখেছেন। যারা সেই আত্মাকে দেখেনি তারা অহংকেই বড় করে দেখে। তারা বাহিরের দরজার কাছেই ঠেকে গিয়েছে। তারা কেবল আমার খাওয়া আমার পরা, আমার বুদ্ধি আমার মত, আমার খ্যাতি আমার বিত্ত—একেই প্রধান করে দেখে। এই যে অহঙ্কার এতে সত্য নেই, নিত্য নেই; এ আলোকের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, আঘাতের দ্বারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু যে লোক আত্মাকে দেখেছে সে আর অহংয়ের দিকে দৃক্‌পাত করতে চায় না। তার সমস্ত অহংয়ের আয়োজন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে প্রদীপে আলোকের শিখা ধরে নি সেই ত নিজের প্রচুর তেল ও পল্‌তের সঞ্চয় নিয়ে গর্ব্ব করে—আর যাতে আলো একবার ধরে গিয়েছে সে কি আর নিজের তেল পল্‌তের দিকে ফিরে তাকায়? সে ঐ আলোটির পিছনে তার সমস্ত তেল সমস্ত পল্‌তে উৎসর্গ করে দেয়। কিন্তু সে একেবারে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সে আর নিজের আড়ালে গোপনে থাক্‌তে পারে না।

ন ততো বিজুগুপ্সতে। কেন? কেননা তিনি অনুপশ্যতি আত্মানং দেবং। তিনি আত্মাকে দেখেছেন, দেবকে দেখেছেন। দেব শব্দের অর্থ দীপ্তিমান। আত্মা যে দেব, আত্মা যে জ্যোতির্ম্ময়। আত্মা যে স্বতঃপ্রকাশিত। অহং প্রদীপ মাত্র, আর আত্মা যে আলোক। অহং দীপ যখন এই দীপ্তিকে এই আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে কি আর অহঙ্কারের সঞ্চয় নিয়ে থাকে? তখন সে আপনার সব দিয়েই সেই আলোকেই প্রকাশ করে।

সে যে তাঁকে দেখেছে যিনি ঈশানো ভূতভব্যস্য, যিনি অতীত ও ভবিষ্যতের অধিপতি। সেই জন্যেই সে যে সেই বৃহৎ কালের ক্ষেত্রেই আপনাকে এবং সব কিছুকেই দেখ্‌তে পায়। সে ত কোনো সাময়িক আসক্তির দ্বারা বদ্ধ হয় না কোনো সাময়িক ক্ষোভের দ্বারা বিচলিত হতে পারে না। এই জন্যই তার বাক্য ও কর্ম্ম নিত্য হয়ে ওঠে—তা কালে কালে ক্রমশই প্রবলতর হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে, যদি বা কোনো এক সময়ে কোনো কারণে তা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তবে নিজের আচ্ছাদনকে দগ্ধ করে' আবার নবীনতর উজ্জ্বলতায় সে দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল—তার উপরে ভূত ভবিষ্যতের যিনি ঈশান তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল—এই জন্যে সেই দীক্ষা ভিতরে থেকে তাঁর জীবনকে ধনী গৃহের প্রস্তর-কঠিন আচ্ছাদন হতে সর্ব্বদেশ সর্ব্বকালের দিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে—এবং সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনও প্রতিদিন এ'কে সৃষ্টি করে তুলচে।

তিনি আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হল যেদিন এর সপ্তপর্ণের ছায়ায় এসে বসলেন সেদিন তিনি জান্‌তেন না যে, তাঁর জীবনের

সাধনা এইখানে নিত্য হয়ে বিরাজ করবে। তিনি ভেবেছিলেন নির্জ্জন উপাসনার জন্যে এখানে তিনি একটি বাগান তৈরি করেছেন। কিন্তু ন ততো বিজুগুপ্তে। যে জায়গায় বড় এসে দাঁড়ান সে জায়গাকে ছোট বেড়া দিয়ে আর ঘেরা যায় না। ধনীর সন্তান নিজেকে যেমন পারিবারিক ধনমানসম্ভ্রমের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি সকলের কাছে তাঁকে বেরিয়ে পড়্‌তে হয়েছে—তেমনি এই শান্তিনিকেতনকেও তিনি আর বাগান করে রাখতে পারলেন না—এ তাঁর বিষয়সম্পত্তির আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে বেরিয়ে পড়েছে,—এ আপনিই আজ আশ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি ঈশানো ভূতভব্যস্য, তাঁর স্পর্শে বোলপুরের মাঠের এই ভূখণ্ডটুকু ভূত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্চে সেই তপোবনের কাল। যে কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং" আত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে।

শুধু ভূতকাল নয়, এই আশ্রমটির মধ্যে একটি ভবিষ্যৎকালের আবির্ভাব আছে। কারণ, সত্য কোন অতীতকালের জিনিষ হতেই পারে না। যা একেবারেই হয়ে চুকে গেছে, যার মধ্যে ভবিষ্যতে আর হবার কিছুই নেই তা মিথ্যা, তা মায়া। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আত্মার সঙ্গে ভূমার যোগসাধনা এই যদি সত্য সাধনা হয় তবে এই সাধনার মধ্যে এসে উপস্থিত না হলে কোনো কালের কোনো সমস্যার মীমাংসা হতে পারবে না। এই সাধনা না থাকলে সত্যের সঙ্গে মঙ্গলকে আমরা এক করে দেখতে পাব না—মঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরের আমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বসব—এই সাধনা না থাকলে আমরা জগতে অনৈক্যকেই বড় করে জান্‌ব এবং স্বাতন্ত্র্যকেই পরম পদার্থ বলে জ্ঞান কর্‌ব—পরস্পরকে খর্ব্ব করে প্রবল হয়ে ওঠবার জন্য কেবলই ঠেলাঠেলি করতে থাক্‌ব—সমস্তকে এক করে নিয়ে যিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতংরূপে বিরাজ কর্‌চেন তাঁকে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করবার জন্যে না পাব অবকাশ না পাব মনের শান্তি।

অতএব সংসারের সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত কাড়াকাড়ি মারামারি যাতে একান্ত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সে জন্যে এক জায়গায় শান্তং শিবং অদ্বৈতং-এর স্বরটিকে বিশুদ্ধ ভাবে জাগিয়ে রাখ্‌বার জন্যে তপোবনের প্রয়োজন। সেখানে ক্ষণিকের আবর্ত্ত নয়, সেখানে নিত্যের আবির্ভাব, সেখানে পরস্পরের বিচ্ছেদ নয় সেখানে সকলের সঙ্গে যোগের উপলব্ধি। সেখানকারই প্রার্থনামন্ত্র হচ্চে অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়।

সেই তপোবনটি মহর্ষির জীবনের প্রভাবে এখানে আপনি হয়ে উঠেছে। এখানকার বিরাট প্রান্তরের মধ্যে তপস্যার দীপ্তি আপনিই বিস্তীর্ণ হয়েছে; এখানকার তরুলতার মধ্যে সাধনার নিবিড়তা আপনিই সঞ্চিত হয়ে উঠেছে; ঈশানো ভূতভব্যস্য এখানকার আকাশের মধ্যে তাঁর একটি বড় আসন পেতেছেন। সেই মহৎ আবির্ভাবটি আশ্রমবাসী প্রত্যেকের মধ্যে প্রতি-

দিন কাজ করচে। প্রত্যেক দিনটি প্রান্তরের প্রান্ত হতে নিঃশব্দে উঠে এসে তাদের দুই চক্ষুকে আলোকের অভিষেকে নির্ম্মল করে দিচ্চে—সমস্ত দিনই আকাশ অলক্ষ্যে তাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে জীবনের সমস্ত সঙ্কোচগুলিকে দুই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত করে দিচ্চে—তাদের হৃদয়ের গ্রন্থি অল্পে অল্পে মোচন হচ্চে, তাদের সংস্কারের আবরণ ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্চে, তাদের ধৈর্য্য দৃঢ়তর ক্ষমা গভীরতর হয়ে উঠচে—এবং আনন্দময় পরমাত্মার সঙ্গে তাদের অব্যবহিত চেতনাময় যোগের ব্যবধান একদিন ক্ষীণ হয়ে দূর হয়ে যাবে সেই শুভক্ষণের জন্যে তারা প্রতিদিন পূর্ণতর আশার সঙ্গে প্রতীক্ষা করে আছে। তারা দুঃখকে অপমানকে আঘাতকে উদার শক্তির সঙ্গে বহন করবার জন্য দিনে দিনে প্রস্তুত হচ্চে—এবং যে জ্যোতির্ম্ময় পরমানন্দ ধারা বিশ্বের দুই কূলকে উদ্বেল করে দিয়ে নিরন্তরধারায় দিক্‌দিগন্তরে ঝরে পড়ে যাচ্চে জীবনকে তারই কাছে নত করে ধরবার জন্যে তারা একটি আহ্বান শুন্‌তে পাচ্চে।

এই তপোবনটির মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্যময় সৃষ্টির কাজ চল্‌চে সেই রহস্যটি আমাদের মধ্যে কে দেখতে পাচ্চে! যে একটি জীবন দেহের আবরণ আজ ঘুচিয়ে দিয়ে পরমপ্রাণের পদপ্রান্তে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছে সেই জীবনের ভাষামুক্ত স্বরমুক্ত অতি বিশুদ্ধ আনন্দ এখানকার নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে নির্ম্মল ভক্তিরসে সরস একটি পবিত্র বাণীকে কেবলি বিকীর্ণ করচে—কেবলি বল্‌চে তিনি আমার প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি, মনের আনন্দ, সে বলা আর শেষ হচ্চে না—সেই আনন্দের কাজ আর ফুরালো না।

জগতে একমাত্র আনন্দই যে সৃষ্টি করে, সৃষ্টির শক্তি ত আর কিছুরই নেই। এখানকার আকাশপ্লাবী অবারিত আলোকের মাঝখানে বসে আনন্দের সঙ্গে তাঁর যে আনন্দ মিলেছিল, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ সম্মিলন ত শূন্যতার মধ্যে বিলীন হতে পারে না। সেই আনন্দই আজও সৃষ্টি করচে, এই আশ্রমকে সৃষ্টি করে তুলেছে—এখানকার গাছপালার শ্যামলতার উপরে একটি প্রগাঢ় শান্তির সুস্নিগ্ধ অঞ্জন প্রতিদিন যেন নিবিড় করে মাখিয়ে দিচ্চে। অনেকদিনের অনেক সুগভীর আনন্দ-মুহূর্ত্ত এখানকার সূর্য্যোদয়কে, সূর্য্যাস্তকে এবং নিশীথ রাত্রের নীরব নক্ষত্রলোককে দেবর্ষি নারদের বীণার তারগুলির মত অনির্ব্বচনীয় ভক্তির সুরে আজও কম্পিত করে তুলচে। সেই আনন্দসৃষ্টির অমৃতময় রহস্য আমরা আশ্রমবাসীরা কি প্রতিদিন উপলব্ধি করতে পারব না? একদিন একজন সাধক অকস্মাৎ কোথা থেকে কোথায় যেতে যেতে এই ছায়াশূন্য বিপুল প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণ গাছের তলায় বস্‌লেন—সেই দিনটি আর মর্‌লনা—সেই দিনটি বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টিশক্তির মধ্যে চিরদিনের মত আট্‌কা পড়ে গেল, শূন্য প্রান্তরের পটের উপরে রঙের পর রং, প্রাণের পর প্রাণ ফলিয়ে তুল্‌তে লাগল—যেখানে ছিল বিভীষিকা সেখানে একটি পূর্ণতার মূর্ত্তি প্রথমে আভাসে দেখা দিল তার পরে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল, এই যে আশ্চর্য্য রহস্য, জীবনের নিগূঢ় ক্রিয়া, আনন্দের নিত্যলীলা, সে কি আমরা এখানকার শালবনের মর্ম্মরে, এখানকার আম্রবনের ছায়াতলে উপলব্ধি করতে পারব না? শরতের অপরিমেয় শুভ্রতা যখন এখানে শিউলি ফুলের অজস্র বিকাশের মধ্যে আপনাকে প্রভাতের পর

প্রভাতে ব্যক্ত করে করে কিছুতে আর ক্লান্তি মানতে চায় না তখন সেই অপর্য্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আরও একটি অপরূপ শুভ্রতার অমৃত বর্ষণ কি নিঃশব্দে আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে না? এই পৌষের শীতের প্রভাতে দিক্‌প্রান্তের উপর থেকে একটি সূক্ষ্ম শুভ্র কুহেলিকার আচ্ছাদন যখন উঠে যায়, আমলকীকুঞ্জের ফলভারপূর্ণ কম্পিত শাখাগুলির মধ্যে উত্তর বায়ু সূর্য্যকিরণকে পাতায় পাতায় নৃত্য করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌদ্র এখানকার অবাধ-প্রসারিত মাঠের উপরকার সুদূরতাকে একটি অনির্ব্বচনীয় বাণীর দ্বারা ব্যাকুল করে তোলে, তখন এর ভিতর থেকে আর একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্মৃতি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে না? একটি পবিত্র প্রভাব, একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য, একটি পরম প্রেম কি ঋতুতে ঋতুতে ফল পুষ্প পল্লবের নব নব বিকাশে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণে তার অধিকার বিস্তার কর্‌চে না? নিশ্চয়ই কর্‌চে। কেননা এই খানেই যে একদিন সকলের চেয়ে বড় রহস্য নিকেতনের একটি দ্বার খুলে গিয়েছে—এখানে গাছের তলায় প্রেমের সঙ্গে প্রেম মিলেছে, দুই আনন্দ এক হয়েছে—যেই এষঃ অস্য পরম আনন্দঃ যে ইনি ইহার পরমানন্দ সেই ইনি এবং এ কতদিন এইখানে মিলেছে—হঠাৎ কত উষার আলোয়, কত দিনের অবসানবেলায় কত নিশীথ রাত্রের নিস্তব্ধ প্রহরে—প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ! সেদিন যে দ্বার খোলা হয়েছে সেই দ্বারের সম্মুখে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, কিছুই কি শুন্‌তে পাব না? কাউকেই কি দেখা যাবে না? সেই মুক্ত দ্বারের সাম্‌নে আজ আমাদের উৎসবের মেলা বসেছে, ভিতর থেকে কি একটি আনন্দ গান বাহির হয়ে এসে আমাদের এই সমস্ত দিনের কলরবকে সুধাসিক্ত করে তুল্‌বে না? না, তা কখনই হতে পারে না। বিমুখ চিত্তও ফির্‌বে, পাষাণ হৃদয়ও গল্‌বে, শুষ্ক শাখাতেও ফুল ফুটে উঠবে। হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, পৃথিবীতে যেখানেই মানুষের চিত্ত বাধামুক্ত পরিপূর্ণ প্রেমের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করেছে সেখানেই অমৃতবর্ষণে একটি আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্জাত হয়েছে—সে শক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না, সে শক্তি চারিদিকের গাছপালাকেও জড়িয়ে ওঠে, চারিদিকের বাতাসকে পূর্ণ করে। কিন্তু তোমার এই একটি আশ্চর্য্য লীলা, শক্তিকে তুমি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করে রেখে দিতে চাও না। তোমার পৃথিবী আমাদের একটি প্রচণ্ড টানে টেনে রেখেছে, কিন্তু তার দড়িদড়া তার টানাটানি কিছুই চোখে পড়ে না—তোমার বাতাস আমাদের উপর যে ভার চাপিয়ে রেখেছে সেটি কম ভার নয়, কিন্তু বাতাসকে আমরা ভারী বলেই জানিনে; তোমার সূর্য্যালোক নানাপ্রকারে আমাদের উপর যে শক্তিপ্রয়োগ কর্‌চে যদি গণনা করতে যাই তার পরিমাণ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই কিন্তু আমরা আলো বলেই জানি শক্তি বলে জানিনে। তোমার শক্তির উপরে তুমি এই একটি হুকুম জারি করেছ সে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কাজ করবে এবং দেখাবে যেন সে খেলা করচে।

কিন্তু তোমার এই আধিভৌতিক শক্তি যা আলো হয়ে আমাদের সামনে নানা রঙের ছবি আঁক্‌চে, যা বাতাস হয়ে আমাদের কানে নানা সুরে গান কর্‌চে, যা বল্‌চে "আমি জল," বলে, আমাদের স্নান করাচ্চে, যা বল্‌চে আমি স্থল, বলে আমাদের কোলে

করে রেখেছে—যখন শক্তির সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের যোগ হয়, যখন তাকে আমরা শক্তি বলেই জান্‌তে পারি—তখন তার ক্রিয়াকে আমরা অনেক বেশী করে অনেক বিচিত্র করে লাভ করি; তখন তোমার যে শক্তি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে কাজ করছিল সে আর ন ততো বিজুগুপ্সতে—তখন বাষ্পের শক্তি আমাদের দূরে বহন করে বিদ্যুতের শক্তি আমাদের দুঃসাধ্য প্রয়োজন সকল সাধন করতে থাকে। তেমনি তোমার অধ্যাত্ম শক্তি আনন্দের প্রস্রবণ থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে এই আশ্রমটির মধ্যে আপনিই নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে, দিনে দিনে ধীরে ধীরে, গভীরে গোপনে—কিন্তু সচেতন সাধনার দ্বারা যে মুহূর্ত্তে আমাদের বোধের সঙ্গে তার যোগ ঘটে যায় সেই মুহূর্ত্ত হতেই সেই শক্তির ক্রিয়া দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাদের জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। তখন সেই যে কেবল একলা কাজ করে তা নয়, আমরাও তখন তাকে কাজে লাগাতে পারি। তখন তাতে আমাতে মিলে সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হয়ে উঠ্‌তে থাকে। তখন যাকে কেবলমাত্র চোখে দেখ্‌তুম, কানে শুন্‌তুম, অন্তর বাহিরের যোগে তার অনন্ত আনন্দরূপটি একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে—সে আর ন ততো বিজুগুপ্সতে। সে ত কেবল বস্তু নয়, কেবল ধ্বনি নয়, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ।

জ্ঞানের যোগে আমরা জগতে তোমার শক্তিরূপ দেখি, অধ্যাত্মযোগে জগতে তোমার আনন্দরূপ দেখিতে পাই। তোমার সাধকের এই আশ্রমটির যে একটি আনন্দরূপ আছে সেইটি দেখতে পেলেই আমাদের আশ্রমবাসের সার্থকতা হবে। কিন্তু সেটি ত অচেতনভাবে হবে না, সেটি ত মুখ ফিরিয়ে থাক্‌লে পাব না। হে যোগী, তুমি যে আমাদের দিক থেকেও যোগ চাও—জ্ঞানের যোগ, প্রেমের যোগ, কর্ম্মের যোগ। আমরা শক্তির দ্বারাই তোমার শক্তিকে পাব ভিক্ষার দ্বারা নয় এই তোমার অভিপ্রায়। তোমার জগতে যে ভিক্ষুকতা করে সেই সব চেয়ে বঞ্চিত হয়। যে সাধক আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করে' আত্মানং পরিপশ্যতি, ন ততো বিজুগুপ্সতে; সে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে আপনাকে আর গোপন করতে পারে না। আজ উৎসবের দিনে তোমার কাছে সেই শক্তির দীক্ষা আমরা গ্রহণ করব। আমরা আজ জাগ্রত হব, চিত্তকে সচেতন করব, হৃদয়কে নির্ম্মল করব, আমরা আজ যথার্থ ভাবে এই আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করব। আমরা এই আশ্রমকে গভীর করে, বৃহৎ করে, সত্য করে, ভূত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে একে সংযুক্ত করে দেখব, যে সাধক এখানে তপস্যা করেছেন তাঁর আনন্দময় বাণী এর সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে সেটি আমরা অন্তরের মধ্যে অনুভব করব—এবং তাঁর সেই জীবনপূর্ণ বাণীর দ্বারা বাহিত হয়ে এখানকার ছায়ায় এবং আলোকে, আকাশে এবং প্রান্তরে, কর্ম্মে এবং বিশ্রামে, আমাদের জীবন তোমার অচল আশ্রয়ে, নিবিড় প্রেমে, নিরতিশয় আনন্দে গিয়ে উত্তীর্ণ হবে এবং চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু তরুলতা পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সকলের মধ্যে তোমার গভীর শান্তি, উদার মঙ্গল ও প্রগাঢ় অদ্বৈতরস অনুভব করে শক্তিতে এবং ভক্তিতে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌তে থাকবে!

—

ভূকম্পন।

ঝড়বৃষ্টি এবং বৈদ্যুতাগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাতে আমাদের যে ক্ষতি করে, ভূমিকম্পে তাহা অপেক্ষা বড় অল্প ক্ষতি হয় না। বড় বড় ঝড়ের আগমন বার্ত্তা আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে অন্ততঃ কিছু পূর্ব্বে জানা যায়। সুতরাং একটু সতর্ক হইবার অবকাশ থাকে। কিন্তু ভূমিকম্পের আগমন একেবারে আকস্মিক। ইহাতে মেঘাড়ম্বর বা ঘনঘটা নাই, গর্জ্জন বর্ষণ নাই। যখন সকলে নিশ্চিন্ত, হয় তো গভীর সুষুপ্তিতে মগ্ন, সেই সময়ে হঠাৎ ভূমিকম্প উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বনাশ করিয়া দেয়। ইহার স্থানাস্থান বা কালাকাল নাই।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ভূমিকম্পবহুল স্থানগুলির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কের আকর্ষণের সহিত ভূমিকম্পের দূর সম্বন্ধের কল্পনাও করিয়াছেন, কিন্তু প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট স্থান কাল অনুসারে ভূমিকম্প হয় না। মানচিত্রের যে সকল অংশে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা-জ্ঞাপক কালো রেখা অঙ্কিত নাই, সেই সকল স্থানও এখন ভূমিকম্পের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতেছে না!

বহুদিন হইল আমার এক বৃদ্ধা ধাত্রীর নিকট গল্প শুনিয়াছিলাম, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ সূর্য্যের উদয়াস্ত প্রভৃতি ঘটনাগুলি স্বর্গের ব্যাপার। স্বর্গের সহিত হিন্দু-শাস্ত্রের সম্বন্ধটা খুব ঘনিষ্ঠ। কাজেই শাস্ত্রকারগণ গ্রহণাদির কাল অনায়াসেই নিরূপণ করিতে পারেন। ভূমিকম্পের উৎপত্তি পাতালে। সুতরাং খৃষ্টান্ মুসলমান্ প্রভৃতি যে সকল জাতি মৃতদেহ মাটিতে পুঁতিয়া পাতালের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে, ভূমিকম্পের রহস্য আবিষ্কার করার অধিকার কেবল তাহাদেরি আছে। বৃদ্ধা কথাগুলি যে ভাবে বলুক না কেন, এখন দেখিতেছি তাহার কথার সার্থকতা আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণ চন্দ্রসূর্য্য এবং গ্রহ উপগ্রহাদির গতিবিধি অতি সূক্ষ্মভাবেই গণনা করিতে পারিতেন। বলা বাহুল্য তাঁহারা আধুনিক জ্যোতিষী-দিগের ন্যায় বড় বড় দূরবীন্ বা পর্য্যবেক্ষণের উপযোগী অপর কোন যন্ত্র ব্যবহার-করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহারা কেবল পরিবীক্ষণ দ্বারা যে সকল অত্যাশ্চর্য্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অদ্ভূত। ভূমিকম্প কেন তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই জানি না। কেবল পরিবীক্ষণ দ্বারা ব্যাপারটির আলোচনা করিলে হয় তো তাঁহারা অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিতেন। এখন যাঁহারা ভূকম্পন সম্বন্ধীয় গবেষণা করিয়া ইহার কালাকাল নির্ণয়ের উদ্যোগ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই পাতালের সহিত সম্বন্ধ আছে,—প্রায় সকলেই খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী।

আজকাল ভূমিকম্প সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা চলিতেছে, কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও তাহার লেশমাত্র ছিল না। সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো মাল্‌টা পূর্ব্ববঙ্গ এবং ধর্ম্মশাল প্রভৃতি স্থানের বৃহৎ ভূমিকম্পগুলির পর, যেন বিষয়টি বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এখন নানা দেশের বড় বড় সহর মাত্রেই ভূকম্পনবীক্ষণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুযোগ্য বৈজ্ঞানিকগণ সেই সকল স্থানে বসিয়া হাজার হাজার মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের ভূমিকম্পের পরিচয় গ্রহণ করিতেছেন। এই সকল পর্য্যবেক্ষণের ফলে, ভূকম্পন সম্বন্ধে যে সকল বৈজ্ঞানিক

কুসংস্কার ছিল তাহা একে একে দূর হইয়া যাইতেছে, এবং যে সকল স্থানে সত্যই প্রবল ভূমিকম্পের আশঙ্কা আছে, তাহাও জানা যাইতেছে। এই নূতন আবিষ্কার-গুলিকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল সহরকে ভূমি-কম্পের অধিকারভুক্ত বলিয়া স্থির করি-তেছেন, এখন নূতন পদ্ধতিতে সেই সকল স্থানে গৃহাদি নির্ম্মিত হইতেছে। পূর্ব্বে বড় বড় ভূমিকম্পে যে প্রকার লোকক্ষয় হইত, সম্ভবতঃ এখন নিশ্চয়ই আর সে প্রকার হইবে না। প্রাচীন পণ্ডিতগণ ভূমিকম্পকে আকস্মিক প্রাকৃতিক উৎপাতের কোটায় ফেলিতেন। বোধ হয় এইজন্যই তাঁহারা ইহার বিশেষ আলোচনা হইতে বিরত ছিলেন। ভূকম্পনবীক্ষণ (Seismograph) যন্ত্রের উদ্ভাবনের পর এই কুসংস্কারও দূর হইয়া গিয়াছে। বায়ুর প্রবাহ, মেঘের উৎ-পত্তি যেমন সুলভ প্রাকৃতিক ব্যাপার, বৈজ্ঞানিকগণ ভূকম্পনকেও ঠিক সেইরূপই দেখিতেছেন। হিসাবে দেখা যায়, প্রতি-বৎসর পৃথিবী প্রায় ছয়শতবার কাঁপিয়া উঠে। কাজেই এত বৃহৎ এবং সুলভ প্রাকৃতিক ব্যাপারকে এখন আর উপেক্ষা করা চলিতেছে না। এই জন্য ভূকম্পন সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাকে অধুনিক বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত করিবায় জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জগ-তের সর্ব্বাংশেই দেখা যাইতেছে। কেবল পর্য্যবেক্ষণ এবং তথ্য সংগ্রহ দ্বারা ঝড় বৃষ্টির উৎপত্তি নিবৃত্তির কালের অনেক রহস্য ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং সেই পদ্ধতিক্রমে যে ভূমিকম্পের কালা-কাল এবং স্থানাস্থান সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব জানা যাইবে না, একথা কেহই বলিতে পারেন না।

সম্প্রতি অধ্যাপক ম্যাকিয়নি (Atto Macioni) ভূমিকম্পের কালনিরূপণের জন্য যে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বড়ই বিস্ময়কর। অধ্যাপকটি নিতান্ত অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নহেন। নানা বৈজ্ঞা-নিক গবেষণার জন্য পণ্ডিতমহলে তাঁহার বেশ সুনাম আছে। সুতরাং তাঁহার আ-শ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অনায়াসেই বলা যায়, ভূকম্পের আগমনবার্ত্তা জানা বোধ হয় এখন আর কঠিন হইবে না।

পূর্ব্বোক্ত অধ্যাপকটি কেবল পরিবীক্ষণ দ্বারা ভূকম্পনের আগমন সংবাদ জানিবার কৌশলটি জানিতে পারিয়াছিলেন। আমা-দের ভারতবর্ষ ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি আকস্মিক প্রাকৃতিক উৎপাতের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। আকাশ বেশ মেঘনির্ম্মুক্ত, হঠাৎ পশ্চিমে একখণ্ড মেঘ উদিত হইয়া প্রকাণ্ড ঝড়-বৃষ্টির সূচনা করিয়া দিল। এ প্রকার ঘটনা অপর দেশে দুর্লভ। যাঁহারা প্রকৃ-তির এইসকল লীলা একটু মন দিয়া পর্য্য-বেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখি-য়াছেন, চঞ্চল হইবার পূর্ব্বেই প্রকৃতি যেন তাহার স্বাভাবিক ভাব ত্যাগ করিয়া অস-ম্ভব গম্ভীর হইয়া পড়ে। বৃহৎ ঝড়ের পূর্ব্বাকার এইপ্রকার অস্বাভাবিক শান্ত-ভাব অতি সুস্পষ্ট বুঝা যায়। পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীগণ, ঝড়বৃষ্টির সময় মানুষের ন্যায় নিরাপদস্থান সহজে খুঁজিয়া লইতে পারে না। কাজেই প্রকৃতির পরি-বর্ত্তনগুলির ফলাফল বুঝিয়া লইয়া তাহা-দিগকে চলাফেরা করিতে হয়। এই জন্য আকস্মিক প্রাকৃতিক উপদ্রবের সম্ভাবনা ইহারা নানা প্রকার লক্ষণ দেখিয়া অনা-য়াসে বুঝিয়া লইতে পারে। দৈনিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া যখন আসন্ন ঝড় বা বৃষ্টির সম্ভাবনা আমরা ঠিক করিয়া উঠিতে

পারি না, পক্ষিগণ তাহা অনায়াসে বুঝিয়া নিজেদের বাসার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে।

অধ্যাপক ম্যাকিয়নি বলিতেছেন, কেবল ঝড়বৃষ্টি নয়, ভূমিকম্পেরও আগমনের পূর্ব্বে এমন কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে যাহা আমরা বুঝিতে পারি না; কিন্তু পশুপক্ষীরা অনায়াসে বুঝিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিতে থাকে। ম্যাকিয়নি সাহেব প্রথমে এইগুলির বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

বড় ভূমিকম্পের আক্রমণের কিছু পূর্ব্বে প্রায়ই কতকগুলি মৃদুকম্পন দেখা দেয়। ইতর প্রাণিগণ তাহাদের তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা সেগুলিকে অনুভব করিয়া সতর্কতা অবলম্বন করে, এই কথাই প্রথমে ম্যাকিয়নি সাহেবের মনে হইয়াছিল। কিন্তু ভূমিকম্পন-বীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করায় তাঁহাকে ঐ অনুমান ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যন্ত্রে মৃদু ভূকম্পনের সুস্পষ্ট রেখাপাত হইতেছে, অথচ পশুপক্ষিগণ নির্ভীক মনে বিচরণ করিতেছে, এপ্রকার দৃশ্য তিনি একাধিক বার সুস্পষ্ট দেখিয়াছিলেন। কাজেই ভূকম্পনের পূর্ব্বলক্ষণ আবিষ্কারের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রবল ভূমিকম্পের অনেক পূর্ব্বে যে সকল মৃদুকম্পন সুরু হয়, তাহা ভূস্তর এবং ভূপ্রোথিত শিলাগুলির মধ্যে এক সংঘর্ষণ উপস্থিত করে। ঘর্ষণ হইলেই তাপ ও বিদ্যুতের উৎপত্তি অনিবার্য্য। কাজেই ভূমিকম্পের প্রবল আক্রমণের পূর্ব্বে ভূতল বিদ্যুৎ-যুক্ত হওয়া কোনক্রমেই বিচিত্র নয়। অধ্যাপক ম্যাকিয়নি এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া মনে করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ পশুপক্ষিগণ ভূকম্পনের পূর্ব্বক্ষণে ঐ স্তরের ঘর্ষণজাত বিদ্যুতের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হইয়া পড়ে।

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগকে বিদ্যুতের যুগ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অতি সামান্য বিদ্যুতের অস্তিত্ব জানিয়া তাহার কার্য্যাদি পরীক্ষা করিবার অনুরূপ নানাপ্রকার যন্ত্র এখন অতি ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারেও সজ্জিত পাওয়া যায়। সুতরাং ভূকম্পনের পূর্ব্বকার মৃদুকম্পন দ্বারা যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাহার অস্তিত্ব বুঝিবার জন্য ম্যাকিয়নি সাহেবকে কোন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে হয় নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তারহীন টেলিগ্রাফ (Wireless Telegraphy) যন্ত্রে যেমন বহুদূরের বৈদ্যুতিক সঙ্কেত গ্রহণ করা যায়, সেইপ্রকার কোন এক উপায়ে নিশ্চয়ই ভূকম্পনের পূর্ব্বকার বিদ্যুতের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, তারহীন টেলিগ্রাফ্ যন্ত্রের আকার প্রকার যতই জটিল হউক না কেন, যে মূল ব্যাপারটি লইয়া উহা গঠিত তাহা অতি সরল। সে সংবাদ প্রেরণ করে, সঙ্কেত অনুসারে বিদ্যুৎ নিঃসরণ (Discharge) করাই তাহার কাজ। সাধারণ রুমক্রফস্ কয়েলের (Ruhmkorffs coil) মত কোন যন্ত্র দ্বারা এই কার্য্য করা হইয়া থাকে। সর্ব্বব্যাপী ঈথরে তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে যখন সেই নিঃসরণগুলি বিদ্যুৎবেগে চারিদিকে ছুটিতে থাকে, তখন তাহাদিগকে যন্ত্রের ফাঁদে ফেলিয়া সঙ্কেত আদায় করা সংবাদ গ্রাহকের এক মাত্র কাজ। সংবাদ-গ্রাহক যন্ত্রের মূল ব্যাপারটিও অতি সহজ। যন্ত্রটি (Coherer) কতকগুলি লোহার গুঁড়ায় পূর্ণ রাখা হয়, এবং ব্যাটারির তারের দুই প্রান্ত সেই গুঁড়ার সহিত সংযুক্ত থাকে। সাধারণতঃ লোহার

গুঁড়ার ভিতর দিয়া ব্যাটারির বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে পায় না। কিন্তু প্রেরকের যন্ত্র হইতে যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছুটিয়া আসে, তাহা গুঁড়ায় ঠেকিলেই ব্যাটারির বিদ্যুৎ লৌহচূর্ণের ভিতর দিয়া চলিতে সুরু করে, এবং তরঙ্গের আগমন বন্ধ হইলে প্রবাহও বন্ধ হইয়া যায়। এই প্রকারে প্রেরকের যন্ত্র দ্বারা গ্রাহকের কলে যে সকল ক্ষণিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারাই প্রেরকের সঙ্কেতগুলিকে বুঝিয়া লওয়া হইয়া থাকে। অধ্যাপক ম্যাকিয়নি ভূমিকম্পের পূর্ব্বকার বিদ্যুতের অস্তিত্ব বুঝিবার জন্য ঐপ্রকার একটা কল (Coherer) পাতিয়া রাখিয়াছিলেন। বার্ত্তাবহ যন্ত্রের বিদ্যুৎ ভূস্তর দিয়াই সঞ্চলন করে। এই জন্য যন্ত্রটিকে মৃত্তিকা সংলগ্ন রাখা হইয়াছিল। ছোট বড় নানা ভূমিকম্পের লক্ষণ ভূকম্পন-বীক্ষণ যন্ত্রে দেখা গেল, কিন্তু ম্যাকিয়নির কলে তাহার চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। ইহাতে তিনি হতাশ হন নাই। যাহাতে অতি মৃদু বিদ্যুতের লক্ষণ ধরা যায়,এপ্রকার একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং ভূমিকম্পের পূর্ব্বকার বিদ্যুৎ পৌঁছিলে ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, সেপ্রকার এক ব্যবস্থাও কলে রাখিয়াছিলেন।

বহুদিন কলের ঘণ্টার বিদ্যুতের সাড়া পাওয়া যায় নাই। ভূকম্পন-বীক্ষণ যন্ত্রেও কোন মৃদু-কম্পনের রেখাপাত হয় নাই। ইহার পর গত ১১ই এপ্রিল তারিখে সহসা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সাধারণ ভূকম্পন-বীক্ষণ যন্ত্রে মৃদু কম্পনের চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণটি অধ্যাপক ম্যাকিয়নি স্বয়ং সিয়ানা নগরের (Sienna) এক বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে পাঠ করিয়াছিলেন, সুতরাং উহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। কাজেই বলিতে হয়, ভূমিকম্পের কাল এখন হইতে আর অজ্ঞাত থাকিবে না। অন্ততঃ কয়েক মিনিট পূর্ব্বে যন্ত্র সাহায্যে ভূমিকম্পের আগমন সংবাদ জানিয়া আমরা সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিব।

জ্ঞানের সীমা নাই। সুতরাং এই ক্ষুদ্র প্রারম্ভ হইতে আমরা ভূকম্পন সম্বন্ধে যে আরো অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিব না, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ভারতের পূর্ব্ব সীমাস্থ আসাম প্রভৃতি স্থানগুলি ভূমিকম্পবহুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রতিদিনই উহাদের কোন না কোন অংশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সুতরাং এইপ্রকার স্থানে ম্যাকিয়নি সাহেবের প্রদর্শিত পন্থায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলে, সুফল প্রাপ্তির খুবই সম্ভাবনা। ভগবান মঙ্গলময়, তাঁহার প্রতি কার্য্যই মঙ্গলকে সার্থক করিবার জন্য নিযুক্ত হয়। কিন্তু কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া কার্য্য এবং মঙ্গলের যোগসাধন হইতেছে তাহা আমরা সহজে বুঝি না। ইহা স্থির করা সত্যই সাধনার বিষয়। গত ১৮৯৬ সালের যে বৃহৎ ভূমিকম্প আসাম প্রদেশ ও পূর্ব্ববঙ্গকে কাঁপাইয়াছিল, তাহা আধুনিক বৃহৎ ভূমিকম্পগুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু ইহার উৎপত্তি-তত্ত্ব আজও রহস্যাবৃত রহিয়াছে; এবং এইপ্রকার একটা বৃহৎ বিপ্লব দ্বারা প্রকৃতির কোন্ মঙ্গল কার্য্যটি সুসাধিত হইল,তাহাও অদ্যাপি কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক ম্যাকিয়নি ভূমিকম্পের গবেষণা সম্বন্ধে যে নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন, হয় তো তাহাই কোন একদিন এই সকল রহস্যের মীমাংসা করিয়া দিবে।

—

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

(চতুর্থ উপদেশের অনুবৃত্তি)

নৈতিক ব্যাপারের আর একটি উপাদান হৃদয়ের ভাব।

এই বিষয়টি সম্বন্ধে বিবৃত করিয়া আমরা এই জটিল নৈতিক ব্যাপারের বিশ্লেষণ শেষ করিব। এই হৃদয়ের ভাব; সমস্ত নৈতিক ব্যাপারের অনুসঙ্গী, এমন কি, প্রতিধ্বনি বলিলেও হয়। ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে, হৃদয়ের ভাব সেই যোগের অনুভূতি মানব-আত্মায় আনিয়া দেয়। পাপ পুণ্যের নিয়মকে এই হৃদয়ের ভাবই সাক্ষাৎভাবে ও জ্বলন্তভাবে কার্য্যে প্রয়োগ করে। এই হৃদয়ের ভাবই সমাজ-প্রতিষ্ঠিত দণ্ড-পুরস্কারের প্রমাণ-স্বরূপ। ইহাই ঐশ্বরিক দণ্ড-পুরস্কারের আভ্যন্তরিক আদর্শ। পরলোকের ভাব—স্বর্গের ভাব আমাদের হৃদয়েতেই প্রতিষ্ঠিত। স্বর্গ-কল্পনা করিবার সময় আমরা যেন আমাদের হৃদয়কেই স্বর্গে স্থাপিত করি।

কোন সৎকার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া (সেই সৎকার্য্যের কর্ত্তা আমিই হই কিংবা অন্যই হউক) আমার অন্তরে একটি সুখ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না। সুন্দর পদার্থ দেখিয়া যেরূপ সুখ হয়, ইহা কতকটা সেই প্রকারের সুখ। আবার কোন কুকার্য্য দেখিলে, আমাদের মনে বিপরীত ভাবের উদয় হয়—কোন কুৎসিৎ বস্তু দেখিলে যে ভাব হয় ইহাও কতকটা সেইরূপ ভাব। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে প্রীতিজনক অপ্রীতিজনক অনুভূতি বলি, ইহা তাহা হইতে খুবই ভিন্ন।

কোন ভাল কার্য্য করিয়া আমাদের মনে যে সন্তোষ জন্মে, উহা অন্য কোন সন্তোষের মত নহে। ইহা স্বার্থ কিংবা গর্ব্বের উল্লাস নহে। ইহা ধর্ম্মজনিত বিমল আত্ম-প্রসাদ। কোন কুকার্য্য করিলে আমাদের পীড়িত অন্তরাত্মা একটা ব্যথা অনুভব করে; আমাদের দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত হয়।

অন্যের কৃত সৎকার্য্য দেখিলেও আমাদের আত্মা অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়। অন্যের যাহা কিছু মহৎ—যাহা কিছু উত্তম—তাহার সহিত আমাদের হৃদয় সর্ব্বতোভাবে সায় দেয়,—তাহার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি হয়। স্বার্থের দ্বারা বিচলিত না হইলে, আমরা স্বভাবতই,—যে ভাল কাজ করে, তাহার স্থানে আপনাকে স্থাপন করি; সে, যে ভাবে উত্তেজিত, আমরাও কতকটা সেই ভাব অনুভব করি।

মন্দ কার্য্য দেখিলে সেইরূপ আমাদের মনে বিরাগ ও ঘৃণা উপস্থিত হয়। যিনি মানব-প্রকৃতির স্রষ্টা, তিনি আমাদের মঙ্গল অনুষ্ঠানে সাহায্য করিবার উদ্দেশেই এই সকল ভাব আমাদের অন্তরে নিহিত করিয়াছেন। এই সকল ভাব ধর্ম্মের পত্তনভূমি না হইলেও, উহারা যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের পরম সহায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে, উহারাই তাহার কল্যাণকর সাক্ষী।

নীতি সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য আমরা যথাযথরূপে বিবৃত করিলাম। যাহা কিছু প্রকৃত তথ্যের বাহিরে—তৎসমস্ত শশ-বিষাণ সদৃশ নিতান্তই অলীক। সেই সব তথ্যের মধ্যে প্রভেদ নির্ণীত না হইলে সমস্তই বিশৃঙ্খলা।

আমরা এই নৈতিকতত্ত্বের আলোচনায়

সহজ জ্ঞান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি। কারণ, সহজজ্ঞানকে অবিশ্বাস করা প্রকৃত বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নহে, তাহাকে ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এবং সেই জন্যই সহজ জ্ঞানকে গোড়ায় মানিয়া লইতে হয়। প্রথমে আমারা স্থূলভাবে নৈতিক ব্যাপারের বর্ণনা করিয়াছি। পরে, নীতির উপাদান সকল বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেকের বিশেষ লক্ষণ কি, তাহাও দেখাইয়াছি।

সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া আমরা একটি সর্ব্বাদিম তথ্যে উপনীত হইয়াছি— সে তথ্যটি নিজের উপরেই নির্ভর করে— সে তথ্যটি কি? না মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের বিচারক্রিয়া। আমরা এই তথ্যের নিকট অন্যান্য তথ্যকে বলিদান দিই নাই। আমরা শুধু বলিয়াছি, কালের হিসাবে ও গুরুত্বের হিসাবে এইটিই সর্ব্বপ্রথম।

সত্য সুন্দর সম্বন্ধীয় বিচারক্রিয়ার সহিত মঙ্গল সম্বন্ধীয় বিচারক্রিয়ার একটা গভীর সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। আমরা তাই দেখিতে পাই,—নীতি, দর্শন, ও সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা নিগূঢ় যোগ আছে। মূলে, মঙ্গলের সহিত সত্যের মিল থাকিলেও সত্যের সহিত মঙ্গলের পার্থক্য এইটুকু যে—মঙ্গল ব্যবহারিক সত্য। সৎকার্য্য অবশ্য-কর্ত্তব্য। সৎকার্য্য ও অবশ্যকর্ত্তব্যতা—এই দুইটি ভাব অবিভাজ্য হইলেও সর্ব্বতোভাবে এক নহে। কেন না, অবশ্য-কর্ত্তব্যতা মঙ্গলের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাদের মধ্যে এই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকাতেই মঙ্গল হইতেই অবশ্যকর্ত্তব্যতা, বিশ্বজনীন ভাব ও স্ব-সম্পূর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাহা মঙ্গল তাহাই অবশ্য-কর্ত্তব্য— ইহাই নৈতিক নিয়ম। ইহাই সমস্ত নীতির ভিত্তিভূমি। এই জন্য আমরা স্বার্থের নীতি ও ভাবের নীতিকে প্রকৃত নীতি হইতে পৃথক্ করিয়াছি। আমরা সকল তথ্যই মানিয়া লইয়াছি, কিন্তু এক শ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত করি নাই।

মানুষের জ্ঞানে যেরূপ নৈতিক নিয়ম, মানুষের কাজে সেইরূপ স্বাধীনতা। স্বাধীনতাকে অবশ্যকর্ত্তব্যতা হইতে সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করা যায়; শুধু তাহা নহে, উহাই স্বাধীনতার একটি অকাট্য প্রমাণ।

মানুষ স্বাধীন জীব হইয়াও কর্ত্তব্যের অধীন;—ইহাতেই মানুষ নীতিমান্ পুরুষ। পুরুষ—এই ধারণাটির মধ্যে অনেকগুলি নৈতিক ভাবের সমাবেশ আছে। তাহার মধ্যে অধিকারের ভাব একটি। পুরুষেরই অধিকার থাকিতে পারে।

এই সকল ধারণার মধ্যে, পাপ পুণ্যের ধারণাকেও ধরিতে হইবে।

অন্য ধারণাগুলি এই পাপপুণ্যের ধারণা হইতে যেন 'মন্‌জুরী' প্রাপ্ত হয়।

পাপপুণ্য বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভাল মন্দের ভেদ, অবশ্যকর্ত্তব্যতা, স্বাধীনতা—এই সমস্ত বুঝাইয়া যায় এবং উহা হইতেই দণ্ড-পুরস্কারের ধারণাটিও উৎপন্ন হয়।

মঙ্গল যদি জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় তবেই উহা অটল ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে পারে। তাই, মঙ্গলের প্রকৃতি জ্ঞানমূলক এই কথা আমরা বারম্বার বলিয়াছি, অথচ উহার মধ্যে যে ভাবের উপাদান আছে তাহাকেও আমরা অগ্রাহ্য করি নাই।

আমাদের প্রত্যেক নৈতিক বিচারক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। সেই সব বিচারক্রিয়ার সহিত হৃদয় সর্ব্বতোভাবে সায় দেয়। যে কার্য্য আমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করি, সে

কার্য্যে আমাদের সুখানুভব হয়; কোন একটা কর্ত্তব্যকাজ সাধন করিয়াছি এবং তাহা স্বাধীনভাবে সাধন করিয়াছি মনে করিলে আমাদের মনে একপ্রকার অপূর্ব্ব সন্তোষ জন্মে।

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা।

তোমারে হৃদয়ে আমি বুঝিব কেমনে,
কি করে রাখিব তোমা নয়নে বচনে?
জীবনের মাঝে মোর সকল সময়ে,
কি করে থাকিবে তুমি বিরাজিত হয়ে?
যে দিকে দেখিব চাহি জগৎ সংসারে,
যেন সেই দিকে পাই দেখিতে তোমারে।
প্রকৃতির চারু দৃশ্যে নয়ন জুড়ায়,
অমনি হৃদয় যেন দেখিবারে পায়,
সব শোভা সব দৃশ্য আছ পূর্ণ করি।
পূর্ণিমার শশী সম, অন্ধকার হরি
আলো করি এ আমার হৃদয় গগন,
ছড়াইয়া কত সুধা মুগ্ধ করি মন।
শান্ত স্নিগ্ধ প্রীতি পূর্ণ হয় এ হৃদয়,
তোমার প্রকাশ যবে হেরি বিশ্বময়।

প্রার্থনা।

আমি পারি প্রাণ ভরে ডাকিতে তোমায়
এই শক্তি দাও দয়া করি।
কার্য্যে বা বসিয়া থাকি আলসে হেলায়
তবু যেন ওই নাম স্মরি।
যেন দেখি তোমারেই সমস্ত সংসারে।
বিশ্বরূপে ভরিবে হৃদয়।
এ জীবন মন প্রাণ রাখ পূর্ণ করে
ওহে পিতা প্রভু দয়াময়।
তোমার মঙ্গল নামে দূরে যায় চলে
অমঙ্গল বাধা ভয় রাশি,
দুঃখ মেঘ কেটে যায়, সুখের হিল্লোলে
দীপ্ত রবি উঠে পরকাশি।
এক মাত্র হে দেবতা হৃদয়ে আমার
পাতিয়াছি তোমার আসন,
ও মঙ্গলরূপে পূর্ণ কর এ সংসার
তোমাতেই তৃপ্ত হোক মন।

শ্রী সরোজকুমারী দেবী

সংগ্রহ।

লেখ্য।—লেখ্য অর্থাৎ দলিল তিন প্রকার। রাজসাক্ষিক সসাক্ষিক, ও অসাক্ষিক। যাহাতে রাজকর্ম্মচারির কোনরূপ স্বাক্ষর আছে তাহা রাজসাক্ষিক; যাহাতে সাক্ষীর নাম স্বাক্ষর আছে, তাহা সসাক্ষিক; আর যাহা কেবল নিজহস্তে লিখিত তাহা অসাক্ষিক। যে লেখ্য বলপূর্ব্বক সাধিত তাহা অপ্রমাণ; যাহা ছল দ্বারা সাধিত তাহাও অপ্রমাণ; দুষিতকর্ম্মরত ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকিলেও তাহাও অপ্রমাণ। স্ত্রীলোক, বালক, পরাধীন, মত্ত, উন্মাদ, ভীত ও তাড়িত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিল অপ্রমাণ। কেহ কোন দলিল লিখিয়া দিয়া পরে অস্বীকার করিলে বা মৃত হইলে অক্ষরাদি মিলাইয়া তাহা সপ্রমাণ করিবে।

সাক্ষী।—রাজা, বেদবিৎ, প্রব্রজিত, ধূর্ত্ত, তস্কর, পরাধীন, স্ত্রীলোক, বালক, দস্যু, অতিবৃদ্ধ, উন্মত্ত, সুরাপায়ী, অভিশপ্ত, পতিত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ব্যসনান্বিত ও অনুরাগান্ধ ব্যক্তি সাক্ষী হইবে না। যাহার পূর্ব্ববাদ অর্থাৎ যে বাদী, তাহার সাক্ষীকে প্রথম জিজ্ঞাসা করিবে। কার্য্যবশতঃ যেখানে পূর্ব্বপক্ষের হীনতা, সেখানে প্রতিবাদীর সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিবে। সাক্ষী মৃত হইলে বা বিদেশে গেলে, যাহারা তাহার বক্তব্য অবগত আছে, তাহারাই সাক্ষীস্থানীয়। সাক্ষীরা সত্যদ্বারা পূত হয়েন। সূর্য্যোদয় হইলে সাক্ষীগণকে আহ্বান করিয়া শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে। ব্রাহ্মণকে "বল" এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে। "সত্য বল" এই বলিয়া ক্ষত্রিয়কে জিজ্ঞাসা করিবে। গো বীজ সুবর্ণ দ্বারা বৈশ্যকে এবং মহাপাতক দ্বারা শূদ্রকে জিজ্ঞাসা করিবে। এবং সাক্ষীগণকে শুনাইবে মহাপাতকী এবং উপপাতকী যে লোকে গমন করে, মিথ্যা সাক্ষীরাও সেই স্থানে গমন করে। জন্মমৃত্যুর মধ্যে যে কিছু পুণ্য কৃত হইয়াছে, মিথ্যা সাক্ষী দিলে সবই বিনষ্ট হয়।

সত্যেনাদিত্যস্তপতি সত্যেন ভাতি চন্দ্রমাঃ,
সত্যেন বাতি পবনঃ সত্যেন ভূর্দ্ধারয়তি,
সত্যেনাপস্তিষ্ঠন্তি, সত্যেনাগ্নিস্তিষ্ঠতি, ধাক্ষ সত্যেন।
সত্যেন দেবাঃ, সত্যেন যজ্ঞাঃ,
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলায়া ধৃতং।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে।

সত্যের বলেই সূর্য্য উদিত হইতেছে, চন্দ্রমা দীপ্তি পাইতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, পৃথিবী ধৃত হইয়া রহিয়াছে, জল রহিয়াছে, অগ্নি জলিতেছে, আকাশ রহিয়াছে, দেবগণ রহিয়াছেন, যজ্ঞ চলিতেছে। এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্যদিকে সত্য, পরিমাপক-যন্ত্রে ধৃত হইলে সত্যই গুরুভার হয়। যে সাক্ষী জানিয়াও চুপ করিয়া থাকে, তাহার পাপ ও দণ্ড কূট-সাক্ষীর তুল্য। যাহার সাক্ষী সত্য বলিবে, বিচারে তাহারই জয়। সাক্ষী দ্বৈধ হইলে যে দিকে অধিক সাক্ষী, তাহারই জয়। উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন সাক্ষীই গ্রাহ্য।

বিষ্ণুসংহিতা।

স্ত্রীজাতির সম্মান।

সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বাশ্চ শুভাং গিরং
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতো হ্যতঃ

স্ত্রীজাতিকে চন্দ্র শৌচ প্রদান করিয়াছেন, গন্ধর্ব্ব মধুর বাক্য দিয়াছেন, পাবক সমস্ত বস্তু অপেক্ষা পবিত্র করিয়াছেন, অতএব স্ত্রীগণ পবিত্র।

আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, কার্য্যদক্ষ, বীরপুত্র-প্রসবিনী প্রিয়-বাদিনী স্ত্রী থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে, রাজা ঐ স্ত্রীকে স্বামীধনের এক তৃতীয়াংশ দেওয়াইবেন। ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতি, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ—বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা স্ত্রীগণকে পরিতুষ্ট রাখিবেন।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

নানা কথা।

আন্তরিকতা।—আমরা যখনই যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, যদি প্রকৃত আন্তরিকতা থাকে—প্রাণগত চেষ্টা থাকে, তবে সে কার্য্যে সিদ্ধলাভ হইবেই হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে আমরা অনেক সময়ে গুরুতর ও হিতকর কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিই বটে, কিন্তু আন্তরিকতা অভাবে সফলতা লাভ করিতে সক্ষম হই না। ইউরোপ খণ্ডে যে সকল হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখি, অকালে তাহার বিনাশ নাই। প্রকৃত স্বার্থত্যাগের সহিত সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়া তাঁহারা হিতকর অনুষ্ঠান গুলিকে সফলতার দিকে লইয়া যান। মুক্তিফৌজের নেতাগণের ভিতরে কি দুর্দ্ধর্ষ অধ্যবসায় কার্য্য করিতেছে। তাঁহারা আপনাদের আত্মত্যাগের ফলে যে কত লোককে আকৃষ্ট করিতেছেন, তাহা আলোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সে দিন জার্ম্মেনির অন্তর্গত বার্লিন নগরের ষ্টেট-থিয়েটারের জনৈক সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী ঘটনাক্রমে মুক্তি-ফৌজের জনৈক ধর্ম্মযাজকের বক্তৃতা পাঠে এবং তাঁহাদের অলৌকিক কার্য্যকলাপে এতই বিমুগ্ধ হইয়া যান, যে তিনি স্বীয় ব্যবসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ হিতকর কার্য্যে আপনার জীবনকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ইহাঁর নাম হেডউইগ ওয়াঙ্গেল। তাঁহার জীবনের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে জর্ম্মানের নরনারী স্তম্ভিত। হায়, ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে প্রকৃত আন্তরিকতা কবে আবির্ভূত হইবে যে আমরা ধন্য হইব।

সভা।—একেশ্বরবাদীগণের সভা বিগত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে লাহোরে হইয়াছিল। প্রোফেসার শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এম, এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত লালা কাশীরাম ও অবিনাশচরণ মজুমদার এই সভার অধিবেশন উপলক্ষে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করেন।

রোমান-কাথোলিক।—১৩ই নবেম্বরর খ্রীষ্টিয়ান লাইফ পত্রিকা বলেন, যে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়, খৃষ্টীয় অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা নিতান্ত লোক-বহুল; কেন না তাহাদের সংখ্যা প্রায় বিশ কোটি। পত্রিকা লেখক বলেন যে প্রাগুক্ত দলের প্রতি তিন জনের ভিতরে দুইজন আদৌ লেখা পড়া জানেন না। যেথানে শিক্ষার বিস্তার নাই, সেথানে মতভেদের সম্ভাবনা কোথায়।

নূতন মাসিক পত্র।—"মন্দির" নামক মাসিক পত্রের ১ম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বিষয় নির্ব্বাচন মন্দ নহে। ইহার ভাষাও সুমার্জ্জিত। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা, ১৩ নং বলরামঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতায় প্রাপ্তব্য।

সমালোচনা।—লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহের বিরচিত "আমি" ও "জীবনী" নামক নবপ্রকাশিত দুইখানি পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। হেমেন্দ্রবাবু ইতিপূর্ব্বে "প্রেম" লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার বহুকালের যোগ। "জীবন" পুস্তকে তিনি বুদ্ধদেব ঈশা মহম্মদ ও প্রাচীন ঋষিগণের বৈরাগ্য ভাব আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সত্য সত্যই বলিয়াছেন প্রেম, যোগ, মিলনই জীবন, তাহার বিপরীতই মৃত্যু। "আমি" পুস্তকে তিনি আমিত্বের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছেন। পুস্তকখানি গবেষণা পূর্ণ। কবিত্ব ও চিন্তার সুন্দর সমাবেশ। পুস্তক দুইখানির প্রাপ্তি স্থান ৩৬ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা, মূল্য যথা-ক্রমে ১৲ ও ।৹ আনা।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, কার্ত্তিক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৩৯৮৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩০৮৬ /৬
সমষ্টি	...	৩৩২৫৮৶৬
ব্যয়	...	৯৩ ৶০
স্থিত		৩২৩২৮ ৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাতকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৬৩২৸৬

৩২৩২৸৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২০০৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত

২০০৲

২০০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৬।০
পুস্তকালয়	...	৸৵০
যন্ত্রালয়	...	১৯৲
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৩৸০
সমষ্টি	...	২৩৯৮৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৯০৸/৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৷
যন্ত্রালয়	...	২। ৬
সমষ্টি	...	৯৩৶০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

অশীতিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ সোমবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

অশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

১১ই মাঘের পবিত্র প্রাতঃকালে আদি-ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় তল লোকে পরিপূর্ণ হইলে শঙ্খধ্বনি হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। উপাসনা প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজ গৃহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলে দণ্ডায়মান হইবা মাত্র নিম্ন লিখিত বন্দনাটি গীত হইতে লাগিল, সকলে স্তব্ধ পুলকে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

তুমি আমাদের পিতা,
তোমায় পিতা বলে যেন জানি,
তোমায় নত হয়ে যেন মানি,
তুমি কোরোনা কোরোনা রোষ।
হে পিতা হে দেব দূর করে দাও
যত পাপ যত দোষ—
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের
যাহাতে তোমার তোষ।
তোমা হতে সব সুখ হে পিতা,
তোমা হতে সব ভালো,
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা
তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে তুমিই ভালো
সকল ভালোর সার—
তোমারে নমস্কার হে পিতা
তোমারে নমস্কার।

সঙ্গীত।
মিশ্র রামকেলী—কাওয়ালি।

তিমির দুয়ার খোলো!
এস, এস নীরব চরণে,
জননী আমার দাঁড়াও
এই নবীন অরুণ কিরণে।
পুণ্য-পরশ-পুলকে
সব আলস যাক্ দূরে!
গগনে বাজুক বীণা
জগৎ-জাগানো সুরে।
জননী জীবন জুড়াও
তব প্রসাদ-সুধা সমীরণে।
জননি, আমার দাঁড়াও
মম জ্যোতি-বিভাসিত নয়নে।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী বেদীর আসন গ্রহণ করিলেন এবং শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় নিম্ন লিখিত রূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।